ভাসান

ভাসান

চন্দন ঘোষ

পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

BHASAN : CHANDAN GHOSH

A collection of contemporary short stories.

পুস্তক
বিপনি

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ১৩৭০

প্রকাশক

অনুপম কুমার মাহিন্দার

পুস্তক বিপনি

২৭ বেনিয়া টোলা লেন

মুদ্রক

প্রাণগোপাল দাস

সোয়ান আর্ট প্রিন্টার্স

·কলকাতা-৭০০০০২

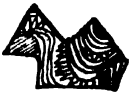
সূচীপত্র

উৎসর্গ

মা ও বাবাকে

এই গল্পগ্রন্থে যে গল্পগুলি দেওয়া হল তার প্রায় সবটাই বিভিন্ন লিটিল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত। প্রথমদিকের লেখাগুলোতে হয়ত আমার চিন্তার দৈন্যতা ধরা পড়বে এটা আমি জানি। তবু ও যা ছিলাম তা গোপন করিনি। প্রগতি বন্ধুরা ক্ষমা করবেন। "শিস" পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় কবি স্বপন চক্রবর্তী ও গল্পকার সমর মুখার্জির স্নেহ না পেলে আমি আদৌ লেখার জগতে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করতাম কিনা সন্দেহ। এ ক্ষেত্রে তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কবি বন্ধু অমিত চক্রবর্তীর মূল্যবান পরামর্শ ও তার সাহায্য আমায় আজীবন ঋণী করে রাখল। লা বেলার কর্ণধার শিল্পী দীপক দে ও ভ্রাতৃপ্রতিম গল্পকার প্রদীপ আচার্যের ঐকান্তিক আগ্রহ এই বই প্রকাশে সবিশেষ সাহায্য করেছে। আমি তাদের কাছে ঋণী। আরও ঋণী সেই বন্ধুবর প্রেসের কম্পজিটার কাম মালিক কাম মেশিনম্যান গোপালদার কাছে, যিনি পিতৃবিয়োগের শোচনীয় দুঃখ বহন করেও ধড়া পরা অবস্থায় আমার এই বইটি প্রকাশের সাহায্য করেছেন, সেই শ্রমিক বন্ধুটির প্রতি রইল অশেষ কৃতজ্ঞতা।

চন্দন ঘোষ



ভাসান

ঘাসের বুকে ছড়িয়ে থাকা শিশিরের মত ভিজে ভিজে মন ছিল কমলেশের। ব্যাপক গভীরতা নিয়ে কিছুটা সময়ের জন্য ছড়িয়ে পড়ত খোলা আকাশের নীচেয়। লতানো গাছ যেমন বুকেই হেঁটে চলে, তেমনতর সহজ আলসেমির মধ্যে একটা আলগা খুশি নিয়ে কাটত ওর সময়।

এই ভিজে মনের চারপাশে ছড়ানো থাকত হলুদ হলুদ ঠাসা সরষের ক্ষেত, আল পেরিয়ে আদিগন্ত মাঠ, মাঠের কোল ঘেঁষে পাড় ভাঙ্গা নদীর ব্যাকুলতা। এই ভিজে মনের আরো কাছে এমনতর গ্রাম ঘেরা ছোট মফস্বল টাউনে ওর শৈশব কাটছে। ওদের বাড়ির এক ফালি বারান্দায় তালপাতার চাটাইয়ের উপর যখন রাত নেমে আসে টুক করে, তখন কমলেশকে ভেসে যেতে হয় পড়ার ফাঁকে ফাঁকে দূরদূরান্তে কখনো দিগ্বিজয়ী রণক্লান্ত সৈনিকের বেশে, আবার কখনো কখনো অতলান্ত সমুদ্রের বুকে ডুবুরীর সাজে মুক্তোর সন্ধানে। এই বয়স, এই মনেরই কাছাকাছি।

এখানে সব আছে। ছোট ছোট মাঠকোঠার মাঝে সেনেদের বনেদী বাড়ি, পিচের রাস্তা, দোকান বাজার, বাড়ির ছাদে এরিয়ালের তার, পালা পার্বণ সব—সবকিছু। রোজ সকালে রিক্সা করে ষ্টেশনে

ছোটে মানুষ মানুষের সঙ্গে আনাজপত্তর দূর দূরান্তে। ঝিম ধরা দুপুরে শিশু গাছের ছায়া নিবিড় পথ পেরিয়ে ওকে এমনতর দৃশ্যের মাঝে রোজ রাস্তায় বেরুতে হয়। বাজারের কাছে ওদের কাটা কাপড়ের দোকান—একফালি টিনের ছাউনি দেওয়া। দুপুরে ওকে রোজই বাবার খাবার নিয়ে যেতে হয়। এই সময় ওর মন পেরিয়ে চলে পরিদৃশ্যমান কতকগুলো পথ পরিবেশের উপর আলতো করে হাত ছুঁয়ে। সেই পথ, পথের পাশে শিশু গাছের বিশাল দেহ, লাইট পোষ্টের গায়ে সিনেমার ছবি, পানের দোকান, টালির ছাউনি দেওয়া বাড়ি ঘর, রেডিও থেকে ভেসে আসা গান। ওকে রোজই এইসব দৃশ্যের মাঝে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে ভেসে যেতে যেতে সেনবাড়ির সামনে এসে ক্ষণিকের জন্য থেমে যেতে হয়। কয়েক যুগের জমিদারীর যথেচ্ছ সম্পত্তির রেশ টেনে এক বুক দম্ভ নিয়ে মাথা উঁচু করে সেনেদের দালানবাড়ি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। বিরাট বিরাট থামওয়ালা দোতলা বাড়ির জাফরি কাটা অলিন্দ, রঙিন পর্দা ঘেরা জানালা, কার্ণিশের দু প্রান্তে কুঁজওলা দুটো মানুষের মূর্তি। কমলেশের কাছে এ বাড়ি সমুদ্রের গভীর তলদেশের মত বিস্ময়কর। কখনো সখনো জানালার পর্দার ফাঁক পেরিয়ে ফর্সা মেদবহুল কয়েকজন রমণীর দ্রুত চলাফেরা চোখে পড়ে। সেনবাড়ির গেটের পাশে ঠাসা মাধবিলতা গাছ গেটের দুপাশ বেয়ে উপরের ঝুলবারান্দার সানসেটকে জড়িয়ে আছে, অসংখ্য মাধবিলতা ফুটে থাকে সব সময়। আর ঠিক এই দুপুরে রোজই ঝুলবারান্দার মাধবিলতা ফুলের সঙ্গে ছায়া ঘেরা রোদের রেণু জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এ বাড়ির বড় তরফের ছোট মেয়ে বুকু। কিবা তার বয়েস। কমলেশের থেকে ছোটই হবে হয়তো। তবুও পরিপাটি করে চুল আঁচড়ানো, ফিকে গোলাপি শাড়ি পরনে, হাতের কনুই অবদি ঢাকা ফুল কাটা ব্লাউজ। টানা টানা দুটো চোখ, ঈষৎ চিকন চিবুক, মৃদু হাসি ছড়ানো মুখের আদল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ঝুলবারান্দার এক পাশে কনু দুটো রেলিংয়ে রেখে উদাস

চোখে ও কি দেখে। মাঝে মাঝে অলস ভঙ্গিতে মাধবিলতা থেকে টুক টুক করে ফুল তুলে এমনিই ফেলে দেয় নীচেয়। কমলেশ রোজই সেনবাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় থমকে দাঁড়ায়, বাঁ দিকে ফেরে। চোখ চলে যায় গেটের নীচে গাছের গোড়ায়। অসংখ্য ফুল ছড়িয়ে থাকে। সেই সময় একটা লালছে আভা ওর চোখের পরিধি জুড়ে-ঘিরে থাকে। ও বোঝে মেয়েটি নিশ্চয় দাঁড়িয়ে আছে ঝুল বারান্দায়। চোখ তুলতেই চোখাচোখি হয়। সেই মৃদু হাসি ছড়ান মুখ। মুহূর্তের জন্য এইসব স্মৃতি নিয়ে কমলেশ ভেসে চলে। বাকি পথ কোথা দিয়ে কেটে যায় খেয়ালই থাকে না। একটা অদ্ভুত ভাল লাগা ভাব ওর মনের আনাচেকানাচে ঘোরাফেরা করে, আর এই ভাললাগা ভাব ওকে করে তোলে অসম্ভব সাহসী।

নদীর পাড় বেয়ে কলঘাটের দিকে যেতে যেতে দু পাশের নির্জন ক্ষেত খামার, বাবলা গাছ, অড়হর ক্ষেত, খেজুর গাছের ফাঁকে ফাঁকে ও বুকুকে যেন দেখতে পায়। মনে হয় ওপারে নদীর ধার দিয়ে একই সঙ্গে বুকুও বুঝি মৃদু হেসে ওকে অনুসরণ করে চলেছে। সেই সময় নদীর জলে ওর চলমান ছায়াগুলো সে দেখতে পায়। কমলেশের ভাল লাগে, অসম্ভব ভাল লাগে। এক সময় কলঘাটে পৌঁছে যায়। বড় বড় পাইপ নদীর পাড় থেকে জলের মধ্যে নেমে গেছে। চারদিক নির্জন নিথর। একটা যান্ত্রিক ঘট ঘট আওয়াজ কেবল নির্জনতাকে বাঁচিয়ে রাখে। পাড়ের ওপর বহু পুরনো ইঁটের ঘর। জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যেকার মেশিনপত্তর দেখা যায়। মনে হয় যেন কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগের কচ্ছপ মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ছাদ ফুঁড়ে একটা চিমনীর মত পাইপ উঠে গেছে ওপরে। মাঝে মাঝে হুস হুস করে ধোঁয়া বের হয়। চারপাশে কলাগাছের ক্ষেত। কমলেশ নদীর কোল থেকে ওপর দিকে উঠে আসে। হাঁক দেয়ঃ ষষ্ঠি, তুই কোথায়।

ডানদিকের আবডাল থেকে উত্তর আসেঃ—এই তো এখানে

তারপর খানিকক্ষণ চুপ। কোথা থেকে হরিয়াল ঘুঘুর ডাক শোনা যায়। আশস্যাওড়ার ঝোপঝাড় পেরিয়ে ও এগোয়। এরই মধ্যে কথা ভেসে ওঠে, কি রে, এত দেরী করলি কেন? কখন মাটি নিয়ে যাব।

কমলেশ মুহূর্তে ভুলে যায় সব কিছু। নদীর পাড় বেয়ে কিছুটা গিয়ে লাফ দিয়ে নামে।

কমলেশ মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যায়। ভাবে ষষ্ঠি কি করে এই মাটির দলা থেকে সুন্দর সুন্দর পুতুল বানায়। ষষ্ঠি লেখাপড়া করে না। থাকে রেজেষ্ট্রী অফিসের কাছে ডোমপাড়ায়। ওদের বাড়ির পেছনে একটা আমবাগান আছে। রোজ দুপুরে কমলেশ আর ও কলঘাটের কাছে আসে। এখানে নাকি ভাল এঁটেল মাটি পাওয়া যায়। ষষ্ঠির মুখে শুনেছে এঁটেল মাটিতে নাকি ভাল পুতুল হয়। এখান থেকে মাটি নিয়ে ওরা চলে যাবে সেই আমবাগানের কাছে। ছুটির দিনে সারি সারি খড়ের চাল দেওয়া দলিল লেখার ঘরগুলোর যে কোন একটা ওরা ইচ্ছে মত বেছে নেয়। ছুটি না থাকলে আমবাগানে। ঝোপঝাড় সরিয়ে একটা পরিষ্কার জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ে। মাটি ছানে। তাতে কাঠের গুঁড়ো মেশায়। তারপর তাঁল তাল মাটির চাঁই ও এগিয়ে দেয় ষষ্ঠির দিকে। এই অবদি ষষ্ঠির সঙ্গে কথা বলে। দূর থেকে রেজেষ্ট্রী অফিসের গুঞ্জন ভেসে আসে। কখনো সখনো গ্রাম থেকে আসা চাষীদের গরুর গাড়ির ছেড়ে দেওয়া গরুগুলো চলে আসে এপাশে। কমলেশকে উঠে ওগুলোকে তাড়াতে হয়। এই সময় রেজেষ্ট্রী অফিসের সামনে রণদের ছোট্ট চায়ের দোকান থেকে তেলছে নিমকি ভাজার গন্ধ ভেসে আসে। গন্ধে জায়গাটা ম ম করে। লোকজন ভাঁড় হাতে করে চায়ে নিমকি ডুবিয়ে খায়। কমলেশ সব কিছু লক্ষ্য করে ফিরে আসে। ইতিমধ্যে ষষ্ঠি ছোট্ট কাঠের ওপর মাটি লাগিয়ে সমান করে দু আঙ্গুল দিয়ে একটা পেটমোটা মানুষের ধড় তৈরী করেছে। পেটের মাঝে দুটো ঝাঁটার

কাঠি দিয়ে ওর গায়ে মাটি লাগাচ্ছে। বুঝতে পারে ও মাকালীর মূর্তি গড়ছে। দেখে অবাক হয়ে যায়। ভাবে, কিভাবে ষষ্ঠি ওর মোটা মোটা আঙ্গুলগুলো দিয়ে একদলা মাটিকে ক্রমশ রূপান্তরিত করছে একটা পরিচিত ছবিতে। এই সময় সে একটু দূরে বুকের কাছে হাঁটু মুড়ে এনে থুতনি রেখে কাদা মাখা শুকনো হাত আড়াআড়ি করে বেড় দিয়ে বসে থাকে। এক সময় ওর চোখের সামনে থেকে পরিদৃশ্যমান জাগতিক অনুভূতি দূরে সরে যায়। পরিবর্তে ভেসে ওঠে ঝিম ধরা দুপুরে শিশুগাছের ছায়াঘেরা পথ, পথের পাশে বিশাল একটা বাড়ির ঝুল বারান্দা আর মাধবিলতা ফুল। স্বপ্নের মধ্যে কমলেশকে ভাসতে হয়। কে যেন ঝুল বারান্দা থেকে ওকে ইশারায় দাঁড়াতে বলে। লক্ষ্য করে, সেই ফর্সা তুলতুলে মেয়েটি। দাঁড়ায়। বাতাসের অলিন্দ বেয়ে নিঃশব্দে কার যেন পায়ের শব্দ শোনা যায়। এক সময় ও অনুভব করে কে যেন ওর হাত ধরে চুপি চুপি আব্দার মেশান গলায় বলছে ঃ চল ছুটে যাই।

ঃ তুমি কোথায় যাবে।

ঃ যেখানে তুমি রোজ যাও।

ঃ আমি তো নদীর পাড়ে যাব।

ঃ আমিও যাব।

ঃ তুমি গিয়ে কি করবে ?

ঃ তুমি যা করবে।

ঃ আমি তো ষষ্ঠির সঙ্গে মাটি তুলব।

ঃ আমিও।

ঃ কাদা ছানাছানি করবো।

ঃ আমিও।

ঃ তবে 'চল'

এক সময় ওরা যেন ছুটে চলে নদীর পাড় ধরে। হাওয়ায় উড়তে থাকে মেয়েটির চুল, আঁচল। পেছনে পড়ে থাকে সরষের ক্ষেতের

হলুদ রং, বাবলাগাছ, অড়হর ক্ষেতের দোলানি, ধানের শিষ, শালিক পাখি আর নদীর বুকের উদাসীন্ হাওয়া।

ঃ কি রে, কি হল তোর, চুপ করে কেন।

কমলেশ মুখ তুলে মৃদু হাসে।

ঃ চল যাই।

পাড় বেয়ে টাউনের দিকে ফেরার সময় হারান বুড়োর ক্ষেতের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। এতটা পথ হেঁটে হাঁপিয়ে পড়েছে। একটু জিরিয়ে নিতে চায়। নদী থেকে জল তোলার জন্য এখানে একটা মেশিন আছে। কেউ কোথাও নেই। একটা গরু জাবর কাটছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মেশিনের বিরাট চাকার সঙ্গে লাগান ছোট ছোট কৌটা থেকে জল পড়ছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। কমলেশ চাকার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। আঙ্গুল দিয়ে চুঁইয়ে পড়া জলের স্পর্শ নিয়ে হঠাৎই আপন মনে বলে ওঠেঃ তুই তো এত সুন্দর সুন্দর পুতুল বানাস, আমায় একটা বানিয়ে দিবি?

ষষ্ঠি মাটির ঝুড়ি নামিয়ে রেখে ওর দিকে ফিরে চায়।

ঃ তোকে তো নিতেই বলি। তুই-ই তো কোন দিন নিলি না। আজ যাওয়ার সময় নিয়ে যাস।

একটা নাম না জানা পাখি ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়। কমলেশ মুখ ফিরিয়ে দেখে ওটা কোথাও বসে কিনা। পাখিটা ওপারে কোথাও বসে না। গাছের মাথার ওপার দিয়ে অলস ভঙ্গিতে ডানা দোলাতে দোলাতে দূরে মিলিয়ে যায়।

ঃ না না, তোকে আমি ওসব পুতুলের কথা বলছি না। সত্যিকারের পুতুল।

ষষ্ঠি অবাক হয়ঃ সত্যিকারের পুতুল। সেটা আবার কি। পুতুল তো পুতুলই।

কমলেশ বোঝাতে পারে নাঃ তুই সেনবাড়ি চিনিস?

ঃ না চেনার কি আছে।

ঃ তুই বুকুকে দেখেছিস ?
ঃ দেখেছি, দারুণ সুন্দর দেখতে। কি ফর্সা।

দুধ উথলে ওঠার মত কমলেশের মনও উথলে ওঠে। তাড়াতাড়ি বলে, হ্যাঁরে, ঠিক বলেছিস আমায় বুকুর মত দেখতে একটা পুতুল বানিয়ে দিবি ? ঠিক যেন অবিকল বুকুর মত হয়। ষষ্ঠি কি যেন ভাবে। তারপর বলে, দূর তাও কখনও হয় নাকি। কাউকে সামনা-সামনি না দেখলে কি করে বানাই। ঠাকুরের মূর্তি করা যায়। জীবন্ত মানুষভারে কেমন করে না দেখে তার মূর্তি গড়া যায়। সামনাসামনি পাওয়া গেলে হয়তো চেষ্টা করে দেখতে পারি।

কমলেশ নিভে যায়। দুপুরের রোদ নিস্তেজ হতে থাকে। ষষ্ঠি উঠে পড়ে বলে, আজ বড্ড বেলা গেল, আজ আর হবে না নে, বুইছিস কমলেশ। কাল বানাব এ মাটিগুলো দিয়ে।

কমলেশ কোন কথা বলে না। ভাবতে থাকে কি করে বুকুকে ষষ্ঠির সামনে বসিয়ে দেওয়া যায়। কোন কুল কিনারা পায় না। কমলেশকে স্বপ্নের মধ্যেই বুকুর পাশে ঘুর ঘুর করে বেড়াতে হয় নিরুপায় হয়ে।

কমলেশদের বাড়ির পিছনে একটা বহুদিনের এঁদো পুকুর আছে। পুকুরের সংলগ্ন একটা পোড়ো বাড়ি। বাড়ির চারিপাশে নানা ধরণের বাহারি ফলের গাছ সংস্কারবিহীন হয়ে পড়ে আছে। চারিদিকে ঝোপঝাড় ওরই মাঝে ভাঙ্গা ভেনাসের মূর্তি। শোনা যায় জগৎ শেঠের বংশের কোন এক পুরুষের বাগানবাড়ি ওটা। পুকুরের পাড় ঘিরে সুপুরী গাছের বাহারি দেওয়াল। জায়গাটা কেমন যেন থমথমে। স্নানঘাটের পাশে বাঁধানো বেদী ছুঁয়ে চাঁপা ফুলের গাছ। একটু হাওয়া দিলেই ওর থেকে হলুদ হলুদ চাঁপা ফুল ঝরে পড়ে। এই অঞ্চলের বাড়ির বউ-ঝিরা রোজ দুপুরে এখানে নাইতে আসে। শোনা যায় এ পুকুরের জল নাকি গঙ্গার জলের মত পবিত্র।

সেদিন দুপুরে কমলেশ রান্নাঘরের দাওয়াতে বসেছিল। সকাল

থেকে টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল আজ আর নিশ্চয় ষষ্ঠি নদীর পাড়ে যাবে না। মা শেঠ পুকুরে নাইতে গেছে। বড্ড দেরী করছে আজ। মন চলে যায় বড় রাস্তায় সেনবাড়ির গেটের কাছে। বুকু নিশ্চয় আজ আর ঝুল বারান্দায় দাঁড়াবে না। এত ঝড়-বৃষ্টি। আজ আবার ইতু পূজোর দিন। মেয়েরা সব পূজো নিয়েই ব্যস্ত। গতদিন ষষ্ঠির কথায় ওর মন ভেঙ্গে গিয়েছিল। ভেবেছিল সেনবাড়ির মেয়েটার মত একটা মূর্তি গড়ে নেবে ষষ্ঠির কাছ থেকে, তা আর হোলো কৈ। ষষ্ঠির বেশী বাড়াবাড়ি। কাউকে সামনাসামনি না দেখলে মূর্তি গড়তে পারে না। একটা চাপা অভিমান জমা হয় ওর মনে। বেড়ার পাশে মার গলা মনে হচ্ছে? উঠে পড়ে ও। কার সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলছে মা! আরে, লোকটা পুকুরের দিকে ছুটে গেল না? কমলেশের কেমন যেন খটকা লাগল। দাওয়া থেকে উঠে বেড়া টপকে মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই শুনতে পেল: 'হায় হায়, কি সর্বনাশ হলরে খোকা। শেঠ পুকুরে একটা মেয়ে ডুবে গেছে।'

: সেকি।

: হ্যাঁ রে, কিঁ আক্কেলরে বাবা বড় লোকদের দু ঘণ্টা আগে জল নিতে এসেছিল ঘাটে সবাই, তারপর যে মেয়েটা বাড়ি ফিরল না, তা কারও হুঁস নেই।

কমলেশের বুক যেন ক্রমশ অস্থির হয়ে পাড়ভাঙ্গা নদীর ব্যাকুল আর্তনাদের মত আছড়ে পড়তে চাইল।

: বড়লোক? বড়লোক বলতে তো সেনদের বোঝায়। মার কাছে সরে এসে দাঁড়াল কমলেশ। 'কোন বাড়ির মেয়ে?' কিন্তু কে কার কথা শোনে: 'ইস, কি সর্বনাশ, অতটুকু ফুটফুটে মেয়ে। হা-হুতাশ করতে করতে মা কমলেশের দিকে ফিরে কি যেন বোঝাতে চাইল। : 'সেনদের বড় তরফের ছোট মেয়ে বুকু।

কমলেশের চোখের আলো হঠাৎ নিভে আসে। হু-হু করে বয়ে

যাওয়া হাওয়ার মধ্যে ও ছুটতে থাকে পুকুর পাড়ের দিকে। পিছনে পড়ে থাকে লোকজন, গমকল, পুকুর ফেরতা রমণীদের বিলাপ। এক সময় খেয়াল হয় ও পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। কমলেশের বয়সী কয়েকটি ছেলে পাড়ে দাঁড়িয়ে আঁতিপাতি করে জলের ওপর চোখ বোলাচ্ছে। কারা যেন জেলে পাড়ায় গেছে টানা জাল আনতে।

'এখনও সময় আছে কমলেশ, এখনও সময় আছে। নেবে পড় জলে। তোমার, ভাসিয়ে দেওয়া মানস প্রতিমা ডুবে যাওয়ার আগে তুলে নাও তুমি।' কে যেন ওর ভেতর থেকে বলে ওঠে। চল জলে নেবে আমরাও খুঁজি।

কমলেশ ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে এগিয়ে যায় বেদীর দিকে। তারপর চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যায় সব কিছু—সেই নির্জন ঝিম ধরা দুপুর, ভাঙ্গা ভেনাসের মূর্তি, চারপাশের বাহারী ফুলগাছ। কেবল ভেসে ওঠে কালো জলের গভীরতা। বেশ খানিকটা জলে ডুবে যায় তারপর ক্রমশ ওপরের দিকে ভুস করে উঠে আসে। এক বুক দম নিয়ে বাঁদিকে ফিরে দেখে ওর সঙ্গের ছেলেগুলো বাঁশ ডোবানো শাপলা ফুলের জটলার কাছে এগিয়ে গেছে। ও ডানদিকের জায়গাটা বেছে নেয়। ওখানে কলমি লতা আর ঝাঁঝির ঝোপ। সেইদিকেই ও এগোতে থাকে। ঝাঁঝিগুলো তাকে অকটোপাশের মত জড়িয়ে ধরে। জলে আলতো করে ভেসে থেকে হাত বাড়িয়ে সেগুলো পট পট করে ছিঁড়ে ফেলার সময় সে এক অদ্ভুত প্রার্থনা করে বসে।

'হে ভগবান, আর কারো হাতে মেয়েটা যেন না ওঠে।'

আবার ডুব দেয়, অন্ধের মত হাতড়ায় 'হে মা কালী, আমি যেন বুকুকে পাই। আবার ডুব দিতে গিয়ে নাকে মুখে জল ঢোকে। তবু সে এগোয় আর ভাবে 'হে সাতভেয়ে কালী ঠাকুর, আমার হাতে যেন বুকুর দেহ স্পর্শ পায়। আমার হাতে ও যেন ওঠে।'

ওর চোখ জ্বালা করে। তবু ডুব দেয়। তারপর এক সময় হঠাৎই হাতে কি যেন ঠেকে। মনে হয় শাড়ির আঁচলের অংশ।

শরীর ভেসে উঠতে চায়। তবুও জোর করে ডুবে ডুবে ও শাড়ির অংশটা ধরে এগোতে থাকে। এক সময় মাথার চুলে হাত ঠেকে এবং সঙ্গে সঙ্গে দম নেবার জন্য জলের ওপর মাথা তুলে চিৎকার করে ওঠে আশ্চর্য এক আনন্দে।—'পেয়েছি, আমি বুকুকে পেয়েছি।' একটা আর্ত চিৎকারের মত ওর গলার শব্দ খান খান করে দেয় নির্জন নিস্তব্ধ জায়গাটাকে। পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা স্তব্ধ লোকদের মধ্যে চাঞ্চল্য পড়ে যায়। কেউ এসে পড়ার আগেই কমলেশ জলের মধ্যে থেকে হেঁচড়ে পাড়ের দিকে টেনে আনে দেহটা। তারপর আড়কোল করে ওকে তুলে ঘাটের দিকে এগোতে থাকে। পায়ের তলায় পিষ্ট হতে থাকে পরিত্যক্ত কাঁটাঝোপ, ভাঙ্গা শামুকের অংশ।

পাড় থেকে লোকজন ছুটে আসে। কমলেশ পাগলের মত চিৎকার করে ওঠে, 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না কেউ।'

দৌড়ে আসা লোকগুলো থমকে দাঁড়ায়।

একটা অদ্ভুত পবিত্রতা ওর সারা শরীরের চারধারে ঘিরে থাকে। গাছের মাথায় ঝড়ো হাওয়ার শোঁ-শোঁ শব্দ ওঠে। বেদীর ওপর অসংখ্য চাঁপাফুল ছড়িয়ে থাকা জায়গাটায় কমলেশ বুকুকে শুইয়ে দেয়। তারপর অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার দিকে। এ যেন জল থেকে তুলে আনা প্রতিমার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আকুল প্রার্থনা। সেই চোখ, সেই সরু চিবুক মুখে মৃদু হাসি, হাতদুটো মুঠো করা। ওর মনে হয় মেয়েটি বুঝি ডুবে যাওয়ার আগে মাধবিলতা ফুল তুলে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল চারপাশে। বুক থেকে আঁচল সরে গেছে। শঙ্খ ধবল বুকের রেখা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। হাঁটুর উপর শায়া, নিটোল সাদা পা—ছোট্ট পায়ের পাতায় এখনও একটা লালছে আভা ফুটে আছে।

কমলেশের শরীর ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। অর্ধনগ্ন এক কিশোরী মেয়েকে বেদীর ওপর শুইয়ে দিয়ে ওরই পায়ের পাতার কাছে হঠাৎ হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়ে সে। এক সময় বুকের মধ্যে উথালি পাথালি

শুরু হয়। বাইরে ঝড়ো হাওয়া ক্রমশ তার বুকের মধ্যেও বইতে থাকে। ও হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। তারপর—পায়ের পাতার ওপর মুখ গুঁজে কান্না চাপতে গিয়ে বার বার একটা নির্জন নদীর পাড়, আমবাগান, সরষের ক্ষেত অড়হর গাছের দোলানির মধ্যে ও বুকুকে দেখতে পায়। মনে হয় ও যেন বলছে, 'কই, ধর'তো দেখি আমায়।'

ঠিক তখনি ওর চোখের সামনে ষষ্ঠির মুখ ভেসে ওঠে। ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে ওর দৃষ্টি আড় হয়। মন উন্মনা হয়। আপন মনে বিড় বিড় করে বলে, 'এই ষষ্ঠি—দেখে যা, তুই বুকুকে দেখে যা। তুই তো বলেছিলি সামনাসামনি না দেখলে মূর্তি গড়তে পারিস না। এই দেখ ওর মুখ, সরু চিবুক, টানা টানা চোখ, শঙ্খের মত বুক, সব—সবকিছুই খোলামেলা তোর সামনে। এবার বল ষষ্ঠি, তুই পারবিতো আমায় এমন একটা মূর্তি গড়ে দিতে ?'

ক্রমশ কমলেশ সেই কান্নার মধ্যেই এক সময় দেখতে পায়, কারা যেন একটা শাড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ঢেকে দিচ্ছে বুকুর অর্ধনগ্ন শরীরটা।

এই ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে আরো লোক ছুটে আসছে পুকুর পাড়ে। তারা এসে বলাবলি করবে আর অবাক হয়ে ভাববে, এই চোদ্দ পনেরো বছরের ছেলেটা পাগলের মত কাঁদছে কেন ?

পাঁচটি স্তবক

অনেক সময় এমন হয় বহুদিনের পুরোণো কথা হঠাৎই মনে পড়ে। ঘুম ধরা দুপুর। জানলার পাশে বনজ ঝোপ ঝাড়ের মাঝে একটা আয়েসী স্বপ্নের মাদকতায় শৈশব থেকে তির্যক রোদের হলুদ আলো কখন সখন ঠিকরে পড়ে। তখন বুকের মধ্যে দু দুটো মরুর হাহাকার শোনা যায়। অথবা আরবের বালুময় জমিতে সোনালী তেলের মতো ঐশ্বর্য্য লুকানো দাম্ভিকতা ঘিরে ধরে সব কিছুর মধ্যে। ঘুম ভেঙ্গে যায়। ভাদ্রের ভিজে ভিজে রোদের বিকলে আমি চোখ মেলে তাকিয়ে থাকি কিছুক্ষণ স্থির নিস্তব্ধ ঘরের চারদিকে মরা মানুষের মত। বাথরুম থেকে ভেসে আসছিল বিকেলের জল আসার শব্দ। কে যেন জড় করা এঁটো বাসনপত্তরগুলো ছড়িয়ে রাখছে। পাশের ঘর থেকে মরচে পড়া পুরানো ফ্যানটা বন্ধ করে দিলে। একেবারে চুপ মেরে যাওয়ার আগে অকারণে এতক্ষণ পরিশ্রান্ত হওয়ার জন্য পাখাটা রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে একটা বিশ্রী শব্দ করে ওঠে। কেউ বোধ হয় স্টোভ ধরানোর জন্য বার দুই দেশলাই কাঠি জ্বালাতে গিয়ে না পেরে চুপ মেরে গেছে। কাপড়ের খসখস আওয়াজ দূরের পর্দা দুলে ওঠে। একটা ছায়া আমার সামনে থেকে পেরিয়ে যায় কলঘরের দিকে। আমি চুপচাপ ভাদ্রের মরা বিকেলে একটা অদ্ভুত বেদনা নিয়ে অনুভব করি সব কিছু।

—নিরু ওঠ। কি এত পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছিস।

মায়র গলা এবং ঘরের পর্দা ওঠে নামে। মায়ের অবয়ব। হাতে একগাদা ছাদ শুকানো কাপড়। দরজার বাঁ পাশে আনলায়। আমি নিরু সাতাশের ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসা কর্মহীন যুবক উঠি। সময়ের পৃথক সান্নিধ্য গুলো আমার কাছে ধরা দেয় না পৃথকভাবে। বাইরে বেরই। রাস্তা রাস্তার মতই আছে এবং ওকে ঘিরে যা কিছু তা' ত আছেই। তবু ক্লান্তিকর সেই একঘেয়ে দৃশ্য বাড়ী ঘর লোকজন। এইসব আমায় পেরুতে হয়। হিপ পকেট থেকে দোমড়ানো চার মিনার বের করি। বড় রাস্তায় আসার আগেই দু আঙ্গুল দিয়ে টিপেটাপে মুখে নেওয়ার মত করে নিই। আগুন—। মুখ তুলে চারপাশে চাই। আর ঠিক তখনই বাস স্টপেজে চোখ যায়। সবিতার সাথে আর দুটো মেয়ে একপলক আমাকে দেখে নিয়ে হাসে নীরবে। আমি হাসি না। তবুও বিরক্তিকর কিছু না ভেবেই মনে মনে সান্তনা আসে। সবিতার মুখটা ফোলা ফোলা লাগে। বেশ উগ্র পেন্ট করা মুখ চোখ বুক জুড়ে রাতের পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত দিনের ঘুম আমায় ওদের কাছেই টেনে নেয়। এক সময় অনুভব করি আমি ওদেরই পাশে।

—কি নিরুদা খুব ঘুমিয়েছেন মনে হচ্ছে। সবিতা পাশের মেয়েটির দিকে হেসে হেসে আমায় যেন কাছে টানে।

—কেন।

—যা মুখ চোখ ফুলিয়েছেন।

কি আশ্চর্য সবিতাকে ত আমিও সেই কথা বলতে পারি। মুখের দিকে তাকাই। নিভে যাই। আসলে ওদের ঘুম ত রাতের শরীরিক ব্যাভিচারের পরিপূর্ণ বিশ্রাম।

—কেমন চলছে।

হাসিগুলো মিলাতে মিলাতেও মিলয়-না। কাঁধের আঁচলটা আলগা করে সবিতা দূরের রাস্তার দিকে তাকাতে তাকাতে বলে।

—যা দিনকাল পড়েছে, বাবুরা আর ফুর্তি-টুরতি করতে চায় কই!

আমার হাতে তখনও সেই দোমড়ানো সিগারেট। আশেপাশে লোকজন। রাস্তার ওধারে আমার গলির মুখে বড় বাড়ীর বারান্দায় মেয়েদের মুখ চোখগুলো আমার পিঠে মৃত মানুষের মত স্পর্শ করার আগেই আমি দেখলাম ওরা বাসের পাদানিতে উঠে পিছন ফিরে ঈষৎ বাঁদিকে হেলে ঘাড় নেড়ে আমার চোখে চোখ রেখে বিদায় নিতে চাইল। আমি দোমড়ানো সিগারেট সহ ডান হাতটি তোলার আগেই হঠাৎ শৈশবের সেই হলুদ-দুপুরে ঘুঘুর ডাকের মধ্যে যে বেদনাময় নিস্তব্ধতা খুঁজে পেতাম সেইরূপ একটা বেদনাময় অনুভূতি যেন হাত দিয়ে স্পর্শ করতে চেয়ে বিড়বিড় করে বলে উঠলুম,—তবু—তবু ত ওরা কিছু করে কিন্তু আমি—।

বাড়ী ঘর লোকজন সবিতা এবং আমাকে না মেনেই প্রকৃতি প্রকৃতির মতই রঙ বদলায়। কি এক অসম্ভব উদাসীন আর দাম্ভিকত য় সকাল হয়—রোদ ঝলসানো হয় দুপুর নীল আকাশে জমে পেঁজা তুলোর মেঘ, কাশের বন ওঠে দুলে, হাওয়ায় লাগে শরতের পবিত্র নির্যাস।

—হায় নিরু তুই কখন এলি।

বেসিনে হাত ধুয়ে উঁচু আয়নায় চুলগুলো ঠিক করে বিদেশী জাহাজের ডেকের মত চকচকে কাপলিন লাগাতে লাগাতে দীপু ফিরে চাইল আমার দিকে। ওর চেহারা ঘিরে তখনও জড়ানো ছিল ঠাণ্ডা অফিস ঘরের মাপা মাপা কথা। আমি ওর হাতে ঝোলান একজিকিউটিভ ব্যাগ দোলানো টেবিলগুলোর পাশ কাটানো স্টেপিং-এর দিকে তাকাতে তাকাতে সরে গেছিলাম অনেক দূরে। আমার বুক থেকে কে যেন গোপনে চুরি করে নিয়ে গেছিল একমুঠো সুখ একমুঠো দুঃখকে।

—তুই বারবার বোল্ড আউট হয়ে যাচ্ছিস কেন? কি হয়েছে তোর আজ!

ছোট্ট একটা মফঃস্বল টাউনে মুনসেফ কোর্টের সামনের ফাঁকা মাঠে

আমায় দীপু বলেছিল কথাগুলো। হলদে কোয়ার্টারের চারিপাশে তার কাঁটার ধার দিয়ে বাহারী ফুলের মাঝে একটা স্থলপদ্ম গাছের নীচেয় তুমি দাঁড়িয়ে দেখছিলে আমাদের খেলা। আমার এখনও চোখে ভাসে সেই সাদা ফ্রক বেড়া বিনুনি করে বাঁধা চুল বেতের চেয়ারে এলানো তোমার ছোট্ট সাদা ব্যাটমিন্টন র্যাকেট সব কিছু। দীপু জানত না সকালে স্থলপদ্ম চুরি করে পাড়তে গিয়ে মালির কাছে আমি ধরা পড়ে গেছিলাম। আমার হাতজোড়া স্থলপদ্মের গায় তখনও রাতের শিশিরের দাগ মুছে যায় নি। ভোরের আলোয় ঘুম ঘুম চোখে তুমি অবাক বিস্ময়ে তোমার বাবার সামনে আমায় বলেছিলে —চুরি করে ফুল না নিয়ে তুমি ত চাইতে পারতে, তোমার মত ত কেউ নয়। দীপু সমীর সঞ্জয় ওরাও ত আমাদের বাড়ীতে আসে কৈ কেউ ত কোন জিনিষে হাত দেয় না—ছিঃ—।

সেই দীপু এখন দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে চিবিয়ে চিবিয়ে এ্যাঙ্গলো সেক্রেটারীকে নোট দেয়। সমীর ব্যাঙ্কের স্টাফ অফিসার হয়ে ত্রিবান্দ্রম ঘুরে এসে সন্ধ্যায় আমাকে শোনায় ওদের সিনিয়র একজিকিউটিভের কেচ্ছা কাহিনী আর আমি ঘুমের মধ্যে একজোড়া শিশিরসিক্ত স্থলপদ্ম হাতে নিয়ে কাদের কাছে ধরা পড়ে শুনি ছিঃ—।

—লাইট হাউসে সানফ্লাওয়ার হচ্ছে। কাল রোববার যাবি নাকি নিরু আমরা যাব ভাবছি।

টেবিলের উপর পড়ে থাকা সিগারেট প্যাকেট থেকে নীরবে সিগারেট নিই। আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে থেমে যাওয়া পাখার বিদ্বেষ, ড্যাম্প ধরা দেশলাই জ্বালানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টা—বিকেলের কলে জল আসার শব্দ সবিতার ঘুম ঘুম চোখ মুখ আর হিপ পকেটে দোমড়ানো চার মিনারের চেহারা। এগুলো দীপুর ক্যাজুয়াল কথা। প্রতি সপ্তাহে রোববারে তিন টাকা নব্বুই-এর টিকিট কেটে আমার যাওয়ার ক্ষমতা যে নেই ও জানে। তবুও আমি বলতে পারি না চল না সেই আগের মত কলেজ কেটে পাঁচাত্তরের লাইনে হল্লা বাজী করে

টিকিট কেটে জামা-টামা খুলে ছু চারটে সিটি-সাটা দিয়ে হুট হুট করে হলে ঢুকি।

—কি যে হয়ে যাচ্ছিস দিন দিন বুঝিনা, নিরুটা একটা হোপলেস। ওকে মাধুরীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাইলাম ও গেলইনা। দীপুকে সমীর বলেছিল কথাগুলো। লিণ্ডসে স্টপেজে একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে পড়েছিলাম সমীরের সাথে। একটু দূরে একটা কালো ফিয়াট। সমীর সিগারেট নিতে নেমেই মুখোমুখি। ওর পরণে কেতাদুরস্ত সাহেবী পোষাক। ও হেসে এগিয়ে এসেছিল। বাস ধরার জন্য অনেকক্ষণ হল দাঁড়িয়ে আছি। ওর কথার মধ্যে আড়ষ্টতা অনুভব করি। সন্ধ্যায় পাঁচুর দোকানের সাবলীলতা নেই।

—পৃথিবী গোল নারে নিরু।

—কেন বলত—?

—না এমনি--এই যেমন তোর সাথে দেখা হয়ে গেল।

—আমার সাথে ত তোর রোজই দেখা হয়। কোথায় এসেছিলি এদিকে। সমীর খুবই ব্যস্ত দেখলুম। বাসস্টপেজের লোকজন আমাদের দেখছিল। বিশেষ করে সাহেবী পোষাকের সমীরকে। হাত তুলে একটু দূরের ফিয়াট দেখালো। গাড়ীর পেছনের কাঁচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে বব করা চুলের কিছু অংশ।

—মাধবী আরে সেই মাধবী।

—কোন মাধবী ?

—আরে চাঁপাগড়ের মুনসেফের মেয়ে মাধবী। হঠাৎ ন্যু মার্কেটে দেখা হয়ে গেল। কিছুতেই ছাড়বে না, বালিগঞ্জে ওদের বাড়ী—কিছুতেই ছাড়বে না ধরে নিয়ে যাচ্ছে—।

আমি জানিনা কখন সমীর চলে গেছে। শুধু এইটুকু মনে আছে যাবার সময় ও একবারও বলেনি আমার সাথে ওর পরিচয় করিয়ে দেবার কথা।

পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের মাঝে আমি এক এক সময় হিংস্র উন্মত্তের মত

পেড়ে নিতে চাই পার্থিব সমস্ত সুখ। মনে হয় সেই সকালের শিশির ভেজা স্থলপদ্ম পাড়তে গিয়ে যদি ধরা না পড়তুম কি হত। বারবার চেষ্টা করি অক্ষমতার কাপলিন লাগাতে। ভীরু হৃদয়ের মাঝে ফুটিয়ে তুলতে ষ্টাফ অফিসার সমীরের ভাব ভঙ্গীগুলো কিংবা মাধবী বা শিখার মত হলুদ ছোপ ধরা শরীরের গন্ধ নিতে।

—ও সব জানিনা আসছে রোববার তোকে যেতে হবে এবং তোর ফিঁয়াসেকে নিয়ে।

আমি বোঝাতে চেষ্টা করি ওদের, দুর দুর ওসব আমার দ্বারা হয় না তবুও নীরব হয়ে থাকি। আমার নীরবতা ওদের উৎসাহিত করে।

—কেন তোর এত সঙ্কোচ বলত। আমরাও যাব সমীর মাধবী আমি শিখা আর তুই ও তোর ফিঁয়াসে। কি করে বোঝাই আমার হৃদয়ে কোন শীতের প্রকম্পিত ভালবাসা রেখে দেবার মত সেফভল্ট নেই। পারিনা।

এবার ও চুপ করে কোনের চেয়ারে পা তুলে জড়সড় হয়ে বসি। দীপুর একতরফা কথায় বুঝি সকালে শহর থেকে দূরে ওদের মিনি পিকনিকে সমীর মাধবী দীপু শিখার সাথে আমাকেও যেতে হবে ফিঁয়াসেকে নিয়ে।

দুপুরের ঘুঘু ডাকছে বুকে। বনজ অজানা গাছের ছায়ায় ছায়ায় কোথায় যেন উড়ছে গঙ্গা ফড়িং। কোন সে নিস্তব্ধ মাঠে তিতির ডাক দিয়ে যায়। আমি হাত তুলে থামাতে চাই পারি না। পরিবর্তে বাঁ দিকটা তির তির করে ওঠে। আমি নিরু সাতাশের যুবক ফিঁয়াসে নেই এখন এই মুহুর্তে এই সত্যকে ওদের কাছে বোঝাতে চাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে কেন যেন ব্যতিক্রম হয় বুঝি না। সূর্যের দিকে খালি চোখে যেমন তাকানো যায় না কালো ঘষা কাঁচ দিয়ে ওর তীব্র আলোকে দেখতে হয় ম্লান করে নিয়ে তেমনি কে যেন আমার চোখে কাল চশমা এঁটে দেয়।

—ঠিক আছে যাব।

—ইয়া দ্যাট উইল বি এ গুড ফান।

সমীর অবাক হয়ে চায় আমার মুখের দিকে। আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করি, দীপু চোখ টিপে সমীরকে ইশারা করে মুচকে হাসে।

কোথায় যেন কারা একটা ডাক ঘুড়ি উড়িয়ে দিয়েছে। নির্জন মাট ঘাট বনজ ঝোপঝাড় দূরের নিরবচ্ছিন্ন বনজ গাছের ছায়া ঘেরা গ্রামগুলোর মাথায় বোঁ—বোঁ—বোঁ—আওয়াজ। আমি ফাঁকা মাঠে অসহায় হয়ে যেন শব্দের উৎস মুখ খুঁজি। ক্রমশ শব্দের গতি বাড়ছে। চারিপাশ নিস্তব্ধ স্থির দৃশ্যে যেন মৃদু কম্পন অনুভব করি। আমার কানের পাশে সেই ঠিকানাবিহীন উন্মত আওয়াজ বোঁ—বোঁ—বোঁ—।

—আর কত দূরে যেতে হবে নিরুদা।

সবিতার কথায় সামনে বসা মাধবী ফিরে চাইল। ও সমীরের পাশে বসে। সমীর স্টিয়ারিংয়ে। আমার পাশে সবিতা তার পাশে দীপু আর গাড়ীর বাঁ দিকে শিখা। আমি নিরু আমার ফিয়াসে নেই এটা মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য দীপুর ইশারাকে আমি চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েই সেই রাতে বাস স্টপেজে দেখা করি সবিতার সাথে। রাত তখন অনেক। শেষ বাসের গুটি কয়েক যাত্রীর সাথে ও নেমেছিল। এখান থেকে ওকে অনেকটা পথ যেতে হবে। তাই দ্রুত পথ চলার তাগিদে এপারের ফুটপাথে এসেই একেবারে আমার মুখোমুখি। ভীত আতঙ্কিত চোখে ও অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল কিছুক্ষণ। মুহূর্তে সন্ধ্যায় পাঁচুর দোকানে সমীরকে ইশারা করে দীপুর চোখ মারবার দৃশ্য সমেত সমস্ত ঘটনাগুলোর মাঝে দীপ্ত ভঙ্গীতে সবিতার হাত উঠে এসেছিল এক করুণ বেদনাময় অনুভূতিতে আমার হাতে। জানিনা সেই রাতে বিছানায় ঘুমানর ব্যর্থ চেষ্টার মাঝে আমার কানে কেন বাজছিল সবিতার শেষ কথাগুলো—শুধু আপনি বলেই যাব। আর আপনার কাছ থেকে টাকাও নেব না। দয়া করে আমার আসল

পরিচয়টি গোপন রাখবেন — ।

—মাই গড । সত্যি নিরু এতদিনের পর প্রকাশ্য দিবালোকে তোর আর একটা রূপ দেখলাম । শ্লা ডুবে ডুবে জল খাওয়া — ।

আমি ক্রমশ ঘেমে উঠছিলাম । সবিতা আমার পাশে দাঁড়িয়ে । সাদা খোলের উপর বুঁটি দেওয়া ঢাকাই শাড়ী স্লিভলেস ফিকে গোলাপী ব্লাউজ মুখে খুব হালকা ধরণের পাউডারের ছোঁয়া । দিনের যাবতীয় আলোর মাঝে সবিতা সাধারণ সবিতার মতই । কেবল রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিকর ছোপ শুধু ওর চোখের কোল ঘেঁষে । আমি ব্যাস্ত হয়ে পড়ি ।

—কি রে আর সব কোথায় ।

ও হাত তুলে দেখায় মেট্রর পাশে 'কাফে ডি মণিকার' সামনে ওরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোকাকোলা খাচ্ছিল । এপারে গাড়ীর কাছে সমীর আমার জন্য দাঁড়িয়েছিল । আমার বুকের ভেতরটা তির তির করে ওঠে । ভেসে ওঠে মুহূর্তে নির্জন ফাঁকা মুন্সেফ কোর্টের সামনে ফাঁকা মাঠে সেই বোল্ড আউটের দৃশ্যগুলো । দীপুর পাশে শিখা ঠিক তার পাশেই মাধবী । ফিকে হলুদ ছোপ ধরা বাটিক সিল্ক শাড়ী ববকরা চুল পরণে স্লিভলেস কালো ব্লাউজ, চোখে সরু রিমের চশমা । শিখা পরেছে গুরু পাঞ্জাবী বেলবটমের উপর । দীপুও তাই । কেবল এপারে জীনের প্যান্টের উপর সমীর চড়িয়েছে টি সার্ট । ওদের চেহারার মধ্যে কোথায় যেন আলগা একটা আভিজাত্যের ছাপ বেশ স্পষ্ট ভাবে আমাদের পার্থক্যকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল বারবার । ওরা হেসে হাত তুলে দাঁড়াতে বলে । এপারে এসে আমার পাশে সবিতাকে দেখে থেমে যায় । মুহূর্তে তিন জোড়া চোখ বুরুশ বুলিয়ে দেয় সবিতার ওপর তারপর আমার দিকে ফিরে চায় । আমার হাত খানেক দূরে মাধবী । একটা অপরিচিত উজ্জ্বল কতগুলো মানুষের মাঝে নিষিদ্ধ জীবনের সবিতার দিকে ফিরে চাই । ও আমার হাত

ধরেছিল। অনুভব করি কি এক আতঙ্কে ও আরো কাছে সরে এসেছে সন্তর্পণে। সমীর এগিয়ে আসল আমাদের কাছে। মুহূর্তে আমি নিরু আমার ধরাপড়া মানসিকতা সামলে নিয়ে সমান তালে কথা বলি। পরিচয় করিয়ে দিই সবিতার সাথে সবার। শুধু গোটা কয়েক মিথ্যার অলঙ্কার গড়ে পরিয়ে দিই সবিতার হাতে গলায় কানে। সেই যে প্রথম দেখার পর সবিতা আড়ষ্ট মেরে গেছে তারপর সারা পথ ও স্বাভাবিক হতে পারেনি। শুধু আমার পাশে জড়সড় হয়ে হাত ধরে বসেছিল। অথচ আমি মাধবীর সাথে অফুরন্ত কথা বলেছি দীপুকে নিয়ে শিখার সাথে তুলনা করেছি। ঠাট্টা করেছি। সবিতার নীরবতা দেখে মাঝে সমীর বলেছিল—কি ব্যাপাররে নিরু সবিতা এত চুপচাপ কেন। আমি মুহূর্তে ওর দিকে চেয়ে জোর করে হেসে বলেছি—হঠাৎ প্রোগ্রাম করতে হয়েছে, বুঝিস'ত বাড়ীর লোকদের জন্য একটু ভয়ে ভয়ে আছে।

সমীরের এক হাত স্টিয়ারিংয়ের উপর একহাত মাধবীর কাঁধের উপর সমীরের কথায় দীপু হেসে ওঠে। বাঁ দিকে মুখ ফিরিয়ে শিখার গালে টুক করে টোকা মেরে বলে কথা কি কেউ বলে, কথা এইভাবে বলাতে হয়।

ওপাশে শিখা দীপুর চুল চেপে ঝাঁকাতে থাকে - এমনভাবে অসভ্যতা করলে গাড়ী থেকে ফেলে দেব কিন্তু।

দীপু যেন ভয় পেয়েছে এমনিভাবে শিখাকে দু হাতে জড়িয়ে মুখ এগিয়ে দেয় ওর দিকে। তারপর ছেড়ে দিয়ে করুণভাবে হাত জোড় করে বলে ওঠে—ক্ষমা কর দেবী, ক্ষমা কর। আড়চোখে সবিতাকে লক্ষ্য করি। ও মুখ ঘুরিয়ে ডানদিকে আমার পাশ ঘেঁষে দূরের মাঠ ময়দানের দিকে তাকিয়ে ছিল। ভয় পেলে যেমন ছোট বাচ্চারা বড়দের গা ঘেঁষে হাত জড়িয়ে ধরে বসে ঠিক তেমনি ভাবে ও আমার গা ঘেঁষে বসেছিল। আমি ওর মুখের দিকে তাকাই। একটা করুণ অভিব্যাক্তি। ও জোর করে হাসতে গিয়েও পারে না। আমি

নিজের মধ্যে একটা অস্বস্তি টের পাই। দীপু শিখা, সমীর মাধবীর আচরণগুলো আমার কাছে বড় বেশী প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ওরা যেন আমার কাছে ওদের সুপ্রিমেসিকে তুলে ধরেছে। ক্রমশ আমি একটা হিংস্র মনোভাবের দেওয়াল গড়ে তুললাম নীরব সবিতার চারপাশে। মনে মনে ফুঁসতে থাকি। যে মেয়ে পয়সার বিনিময়ে পরপুরুষের সাথে ছলা-কলা করে সে যে কেন এমন লজ্জা, সংকোচ নিয়ে বসে থাকে জানি না। সবিতার অস্বাভাবিক আচরণ মনে হল আমায় যেন ছোট করে দিচ্ছিল তাদের কাছে। আসলে আমিও হয়ত চাচ্ছিলাম সবিতা ওদের মত আমার সঙ্গে হাসুক, কথা বলুক। আমি চাইছিলাম আমার অক্ষমতাকে ওরা যেন হেসে না ওড়ায়।

—অমন ভয়ে ভয়ে সরে এসেছ কেন। সহজ হয়ে বস। তুমি কি স্বাভাবিক হতে পার না।

আমার মনে হচ্ছিল আমিও সবিতার কাঁধে হাত রাখি কিংবা দীপুর মত সবিতার বুকে মাথা রেখে মুহূর্তকে ভুলে থাকি। ওরা চারজন বোধ হয় আমার কথা শুনছিল। আসলে দেখছিল আমি পারি কিনা সবিতাকে সহজ করতে। ওরা হো—হো—করে হেসে ওঠে। সমীর গাড়ীর পিক্‌আপ চেঞ্জ করতে করতে বলে

—সবিতা, তুমিত অজানা-অচেনা কোন লোকের পাল্লায় পড় নি। একদিনের জন্য বাড়ীর বাইরে এসেছ। মজা কর অন্তত নিরুর দিকে তাকিয়ে। দেখ 'ত ব্যাচারা কেমন মনমরা হয়ে আছে।

দীপু হঠাৎ শিখার কাঁধ থেকে মাথা তুলে হাত বাড়িয়ে আমার থুতনি নেড়ে মুখে চুক—চুক করে শব্দ করে বলে ওঠে

—আহা, বাচ্চা ছেলে দুদু খাও। না পার ত ব'ল এনে দেব। ওর বলার ভঙ্গীতে সবাই হেসে ওঠে। ঠিক সেই সময় সমীর গাড়ী থামিয়ে দেয়।

নদীর কোল ঘেঁষে একটা ছোট্ট পার্ক। তারই পাঁচিল ঘেঁষে ওদের

গাড়ী দাঁড়াল। ভেতরে সবুজ জাজিমের মাঝে বাহারী পাতার দেওয়াল, সরু রাস্তা নদীর মুখোমুখি। নদীর কোল ঘেঁষে ছোট্ট বাঁধানো চেয়ার, উপরে কংক্রীটের ছাউনি দেওয়া। নদীর ওপারে ঘন সবুজ গাছের ছায়াময় বনবীথি, আকাশে সূর্য মেঘের আড়ালে। নির্জন নিস্তব্ধ চারপাশ। ওরা গাড়ী থেকে ছড়িয়ে পড়েছে। একটানা এতটা পথ একঘেঁয়ে আওয়াজ থেকে মুক্তি পেয়ে খোলা আকাশের নীচে নিঃশ্বাস নিচ্ছে নির্মল সতেজ সবুজের।

বুক থেকে একটা গুমোট কান্না নিয়েই সবিতাও নেমেছে। মেট্রর সামনে থেকে এতটা পথ কি এক অজানা আতঙ্কে ও স্পষ্ট অনুভব করেছে ওর পরিচিত জীবন ও এদের ব্যবহারের পার্থক্য। ওদের চাল-চলন উচ্ছৃঙ্খলতাকেও সহজভাবে মেনে নিতে পারে নি। কোথায় নিরুর সাথে ওর বিরাট পার্থক্য থেকে গেছে। ভয় শুধু ওকে ঘিরেই থাকে নি। নিরুর মুখের দিকে তাকিয়ে ওর কেমন যেন মায়া হয়। মুহূর্তের জন্য রঙ্গীন স্বপ্ন ভাসিয়ে নেয় নির্জন প্রান্তর থেকে শহরের চঞ্চল পথের মাঝে। একটা সুস্থ জীবন সোনালী স্বপ্নের মাদকতায় আপন প্রেমিকের নির্ভরতা ক্ষণিকের মরীচিকার মত আচ্ছন্ন করে ওকে টেনে এনেছিল এতটা পথ। একটা মধ্যবিত্ত সমাজের ঘরণা মানসিকতার চাল-চলন বিধি-নিষেধগুলো ওর মনকে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরেছে। অপর দিকে ওদের ঘরছাড়া বাঁধন হারা উচ্ছলতার মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পায় নি ওর নিজের প্রতি রাতে ছলা-কলার বৈশিষ্ট্যগুলো। সেইজন্য এত ভয়, এত সঙ্কোচ। সহজ হওয়ার নামে যথেচ্ছাচার করাই যদি সাবলীলতা হয় তবে এতটা পথ এককথায় নিরুর সাথে ও কেন আসবে।

– কি হ'ল সবিতা, চল চল। ওখানে চল। তোমায় সবাই খুঁজছে আর তুমি এখনে। দীপু আচমকা এসে পড়ে সামনে। সবিতা এগুতে থাকে। দূরে একটা ছোপের পাশে ওরা ফরাস বিছিয়ে বসে পড়েছে সবাই। গাড়ী থেকে নামানো খাবারের প্যাকেটগুলো সবার

হাতে হাতে। কেবল সবিতার জন্য ওরা অপেক্ষা করছিল। ও একপলক আড়চোখে নিরুকে ছাখে।

মাধবীর পাশে নিরু, ওর পাশে শিখা। শিখার পাশে বসেছে সমীর। সবিতা বসতে যায় সমীরের পাশে। হঠাৎ সমীর নাটকীয় ভঙ্গীতে বলে ওঠে—এখানে নয় নীরবতার দেবী এখানে নয়। তোমার স্থান — । সে ইশারায় মাধবীকে উঠতে বলে, সবিতাকে আমার পাশে এগিয়ে দেয়। সরিতার মুখে মৃছু হাসির ছাপ। কেন জানি না আমি সবিতাকে বুঝতে পারি না। কোথায় যেন একটা বেদনা আমার বুকে বাসা বাঁধে। ইতিমধ্যে দীপু ছোট্ট একটা টেপ বার করে চালিয়ে দিয়েছিল। ওটা থেকে ভেসে আসছিল চটুল ইংরাজী বাজনা। ওরা চারজন মাঝখানে টেপ এবং আমাদের দু'জনকে পাশে রেখে নাচছিল। মুহূর্তে এই পরিবেশ এই চটুল বাজনা মাধবী শিখার সাথে সমীর দীপুর নাচ আমার অসহ্য লাগছিল।

—কিভাবে সবিতা নিজেকে। বিনি পয়সার এই অভিনয়ের জন্যই কি এই দাম্ভিকতা। কি হতো একটু সহজ হয়ে আমার সাথে মিশলে। আমি বুঝি না কিছুই। ওরা নাচ থামিয়েছে। আমি সবিতার পাশে বসে ক্রমশঃ অনুভব করছিলাম আমার দৈন্যতাকে। মনে হল কারা যেন আমার কানের কাছে ফিস ফিস করছে, 'কি রে নিরু সামান্য একজন বারবনিতাও তোর কথা শোনে না! তুই এমনই ক্ষমতাহীন পুরুষ যাকে পয়সার বিনিময়েও কোন বেশ্যা দিতে চায় না শরীর।' সবিতার এই আটপৌরে ঘরণা চাল-চলন মুহূর্তে আমার রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়। আচমকা উঠে দাঁড়াই। এক হেচকা টানে সবিতাকে উঠতে বলি। ও অবাক হয়ে চায়। আমার কোন হুঁশ নেই। এই নৈসর্গিক নিস্তব্ধতা ওপারে নদীর বুকে জমে থাকা বেদনাময় মেঘলা আকাশ দূরের বনবীথি সব কিছু মিলিয়ে যায় আমার সামনে থেকে পরিবর্তে ভেসে ওঠে পাঁচুর দোকানে দীপুর ইশারা, মাধবীর কৈশোরের ধিক্কার আমার কর্মহীন জীবনের গ্লানি একঘেঁয়ে সেই সব দৃশ্য, বিকেলে

জলআসা ড্যাম্প ধরা দেশালাই জ্বালানোর ব্যর্থ চেষ্টা মরচে পড়া পাখার বিকট আওয়াজ। এক প্রকার টানতে টানতে ওকে পার্ক ছাড়িয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়ানো ফিয়াটের কাছে এনে ফেলি।

—কিসের এত সঙ্কোচ তোমার। ভালভাবে দুটো কথাও বলতে পারনা কি ভাবছে ওরা ছিঃ—।

একটা বিস্ময় নির্বাক চাউনি নিয়ে ও আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমার মাথার মধ্যে খুন চেপে যায়।

—লজ্জা করে না তোমার। পয়সা নিয়ে ত' অচেনা অজানা লোকের বিছানায় শোও। তখন এত সঙ্কোচ যায় কোথায়। আমি কি তোমায় পয়সা দেব না ভেবেছ—। আমার কানের কাছে হাজারটা ডাক ঘুড়ির আওয়াজ ঠিকনাবিহীন ভাবে বেজে উঠছিল। আমি অনুভব করছিলাম করা যেন আমার দিকে ছুটে আসছে। ক্রমশ এক অজানা রাগে অপমানে আমার চোখে জমা হচ্ছে মাথার উপর মেঘলা আকাশ। মনে হল খুব দূর থেকে সবিতা বুঝি কিছু বলছে—নিরুদা তোমার পায় পড়ছি তুমি চুপ কর। ওরা এদিকে আসছে আমায় ক্ষমা কর। আমি ভুলে গেছিলাম—সব—সব কিছুই ভুলে গেছিলাম।

আমি ওর মুখের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। পিছনে পার্কের পাঁচিল পেরিয়ে নদীর উপরের আকাশ থেকে দূরে বনবীথি ঘন বাহারী ছায়ার মাঝে আমি যেন দেখতে পাচ্ছিলাম একটা বিষণ্ণ মেয়ের মুখের ছবি ক্রমশ ভেঙ্গে যাচ্ছে। একটা থেকে দুটোয়—দুটো থেকে চারটেয়—তারপর অসংখ্য সবিতায় পরিণত হয়ে কান্না ভেজা বেদনাময় অভিব্যক্তি আমার চোখের জলের সাথে মিশে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় মনে হল কে যেন ভয়ে সঙ্কোচে লজ্জায় জড়সড় হয়ে আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলে উঠল

- আর কতদূরে যেতে হবে নিরুদা।

আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম দিগন্ত থেকে কারণ আমি নিজেই জানি না ঠিকানাবিহীন এপথের দূরত্ব।

মুখোশ

কি এক অজানা ব্যথায় বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। টাল-মাটাল মনের উপর কে যেন বিছিয়ে দিয়েছিল দুঃখের শ্বেত চাদর। শরীরের চারিপাশে অসংখ্য কথার শ্লোগান স্তব্ধ অনুভূতি নিয়ে স্পর্শ করছিল দৃশ্যমান ছবিগুলোকে। দেবেশ দাঁড়িয়ে আছে এখনও গোল-দীঘির রেলিংয়ে দু হাতের উপর ভর দিয়ে। এক বুক নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে চোখের উপর ভেসে ওঠে কান্না ভেজা একটি মেয়ের মুখ। ঘৃণায় থর থর করে কাঁপছে। শুনতে পায় কে যেন বহুদূর থেকে বলছে—"আপনি ব্লাফার—ব্লাফার—মিথ্যুক।"

চব্বিশ নম্বর ট্রামটা এইমাত্র বাঁক নিল। ওখানে এখনও একটি মেয়ে জানলার ধারে বসে ব্যস্ত পথের দিকে তাকিয়ে ভাবছে দেবেশকে। দেবেশের পায়ের কাছে র‍্যাশন ব্যাগটা পড়ে আছে—ময়লা তেলচিটে চাউনি নিয়ে। এখন এই মুহূর্তে খুচরো পয়সা বোঝাই র‍্যাশন ব্যাগটি ওর কাছে ভারী বলে মনে হচ্ছে না। শুধু ভারী লাগছে অসম্ভব ওর মনের এ বোঝা। দেবেশ পিছিয়ে পড়ছিল বারবার—বারবার কে যেন ছুঁড়ে দিচ্ছিল ওকে কতগুলো পরিচিত পরিবেশের মাঝে। ক্রমশ একটা চাপা আক্রোশ কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল প্রতিটি শিরা উপশিরায়। এক সময় পাগলের মত চীৎকার করে উঠতে চায়ঃ "হ্যাঁ আমি দেবেশ

সেন আঠাশ বছরের যুবক স্বীকার করছি আমি ব্লাফ দিই—আমি ব্লাফার—আমি মিথ্যুক, তাতে আমার এতটুকুও লজ্জা নেই।" ওর কথা গলায় আটকিয়ে যায়। উপচিয়ে বেরোয় না। বুকে অসম্ভব জোরে মোচড় লাগে। এক সময় ও খুচরো পয়সা বোঝাই র‍্যাশন ব্যাগেরই উপর বসে পড়েঃ "কি হল দেবেশ বসে পড়লে কেন, উঠে দাঁড়াও, চলতে থাক। ব্যাগ তুলে নাও কাঁধে। একটা মেয়ের কাছে ধরা পড়ে গেছ বলে তুমি বসে যাবে। দূর—দূর। চালাও না বাবা যেমন চালাচ্ছিলে রোজ। গুল মার, ব্লাফ দাও যেমন ব্লাফ মারছ ৯—১৫ বাসে তোমার সহযাত্রীদের কাছে। আরে বাবা একটু চোখ খুলে দেখ, সবাই তোমার মত মিথ্যে আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখেছে তাদের শরীর। আর তা বাদে তুমি ত শরীর ঢাকতে চাওনি চেয়েছ মন।" "হ্যাঁ আমি আমার মনকে ঢাকতে চেয়েছি। আঠাশ বছরের যুবক পেটে ডিগ্রী নিয়ে হন্নে হয়ে এদোর ওদোর ঘুরে ঘুরে শেষে নিরুপায় হয়েই খাবারের দোকানের টেবিল বয়ের চাকরী পেয়েছি। তাতে কি হয়েছে। যে ক্যালিভার থাকলে স্মার্ট হ্যাণ্ডসাম বলে পরিচিত হওয়া যায় যে গুণ থাকলে দায়িত্বশীল চাকরী করা যায় তার কোনটা নেই আমার মধ্যে তবুও কেন আমায় তিন টাকার রোজের টেবিল বয়ের কাজ করতে হয়। আমার থেকে লেস কুয়ালিফায়েড লেস ক্যালিভার বন্ধুরা এর সবগুলো পেতে পারে—আমিই কেবল টেবিল বয়ের চাকরী করব এ কেন হবে"—দেবেশ ভাবছে। কেন আমায় ব্লাফ দিতে হয় বন্ধুদের কাছে। কেন নিজেকে একজিকিউটিভ অফিসার অফ চৌরাসিয়া রাবার ফ্যাকটারি বলে জাহির করতে হয় ওদের কাছে। প্রথম দিন চাকরীর খবর শুনিয়ে ক্যাপসটেনের প্যাকেট ছিঁড়ে সেলিব্রেট করতে হয়—কেন? দেবেশের মনে পড়ে যাচ্ছিল সমস্ত কথা। ৯—১৫র বাসে দুইজনের সিটে তিনজন হয়ে বসে একটা কৃত্রিম ভারিক্কে চালে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ইনক্রিমেণ্ট কম্পালসারী প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সুধীর নায়েকের মোজা

চুরি থেকে মায় গুপ্তজ্ঞানের সরস আলোচনার মধ্যে অংশ গ্রহণ করতে করতে এই সময় দেবেশ নিজেকে ছদ্মবেশের মধ্যে গুটিয়ে আনে টেবিল বয়ের মানসিবতা থেকে একজিকিউটিভ অফিসার অফ চৌরাসিয়া রাবারের মানসিকতায়। আর এই মানসিকতায় সেদিন দেবযানিকে ওর কাছাকাছি নিয়ে এনে ফেলেছিল।

এই একটি মুহূর্তের সন্ধিক্ষণে দেবেশ নিজেকে ভুলে যায়। আর এই সময় অসম্ভব উদাসিন কিম্বা সরল শিশুর দৃষ্টি নিয়ে অজানা বিস্ময়ে সাদা পাতায় ফুটিয়ে তোলে দুই একটি কবিতা। এটা দেবেশের আর এক চেহারা। এতে কোন আবরণ নেই—নেই কোন মেকি মুখোশ। এখানে দেবেশ নিজেই নিজের কাছে শিশু। এ দেবেশ ব্লাফার নয়। সমস্ত পোষাকি পরিবেশ ফেলে রেখে এ সময় আর একটি মানুষ জন্ম নেয় ওর ভিতর। ব্লাফার দেবেশ ক্রমশ রূপান্তরিত হয় কবি দেবেশে।

অথচ সেদিন কবি সম্মেলনে দেবযানি চ্যাটার্জীর মুখোমুখি হওয়ার আগে পর্যন্তও ভাবতে পারেনি এক সময় ওকে ফিরে যেতে হবে কবি দেবেশ থেকে ব্লাফার দেবেশে। দেবযানির উচ্ছল কথাবার্তা মার্জিত ভঙ্গি আগত কবিদের সাথে দাঁড়িয়ে ওদের কবিতা টেপ করার মধ্যে কোথায় যেন একটা ফাঁক ছিল। যার এক প্রান্তে ছিল দেবেশ নিজেই। ও আগ বাড়িয়ে দেবযানির সাথে কথা বলেনি। মেয়েটার হাবভাব বেশ সফিসটিকেটেড মনে হয়েছিল। আর সাথে সাথে ওর চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল একটা দোকান ঘরের দৃশ্য যে দৃশ্যের মাঝে মেনু চার্ট নিয়ে এ টেবিল থেকে ও টেবিলে ঘুরতে দেখেছিল একটি ছেলেকে যার মুখের আদল অবিকল ওর নিজের মত; ডায়াসের পিছনে বসে নিজের মনে ও কথা বলছিল: "কি রে দেবেশ মোয়টা যে তোকে পাত্তা দিচ্ছে না।" : "তা আমি কি করব।" দেবেশ রেগে ওঠে। : "যা সব জায়গায় করিস" । সব জায়গা

আর এ পরিবেশ এক নয়। ঃ "যা যা ফালতু কথা বলিস না। গুল মার ব্লাফ দে নিজের সম্বন্ধে ওর মনে একটা ইমেজ খাড়া করা দেখবি তোকে আপনিই পাত্তা দিচ্ছে। ক্রমশ কে যেন কবি দেবেশের গায় ব্লাফার দেবেশের পোষাক জোর করে চাপিয়ে দেয়। ও হাতছানি দিয়ে মেয়েটিকে ডাকে। দেবযানি লক্ষ্য করে সেই হ্যাণ্ডসাম ছেলেটা ওকে ডাকছে। সকালে এসে প্রথমেই লক্ষ্য করেছে দেবেশকে। তবু ওর উদাসিন ভাব দেবযানিকে ওর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। ও এগিয়ে যায়। ঃ "কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা বলব"— দেবেশ ওকে একটা চেয়ার এগিয়ে দেয়। ঃ "মনে করব কেন? বলুন না।" মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে দেবযানি চেয়ার টেনে ওর পাশে বসে পড়ে। ঃ "বেশী কিছু নয়। শুধু একটু হেল্প—জমা দেওয়া কবিতাগুলোর কবিদের নাম পড়ে যাবেন আপনি, আমি লিখে যাব। দেখছেন ত সবাই কেমন ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন কবিতা পড়ার জন্য।" দেবযানি হেসে ফেলে বলেঃ "ও এই কাজ! আমি ভাবলুম বেশ ভারী বোঝা চাপাবেন।" দেবেশ নিচু হয়ে ফাইল খুলতে খুলতে ওর দিকে তাকায়ঃ "ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন, বোঝা বইতে বলার মত সাহস আমার নেই।" ঃ "সাহস করে নিতে হয়।" দেবেশ চুপ করে নামগুলো লিখতে থাকে। এক সময় দেবযানি বলেঃ "আপনি কবিতা পড়বেন না।" দেবেশ মুখ তোলে। ঃ "ও সব কবিতা লেখা টেকা আমার আসে না। তবে কবিতা পড়ি এই পর্যন্ত। কবিতাকে ভালবাসি প্রেমিকার চেয়েও।" দেবযানি ওর কথা বলার সাবলিলতায় হেসে ফেলে। ক্রমশ ওর মন ওর কথার কাছাকাছি নিয়ে আসে। দেবযানি ঠাট্টা করে বলেঃ "তবে আপনার কি আসে?"
দেবেশ চুপ করে থাকে। তারপর এক রকম অলস ভঙ্গিতে বলে আমরা হচ্ছি কাঠখোট্টা লোক দিন রাত ফ্যাক্টরিতে লেবার দিয়ে কি আর লেখা টেকা আসে।" দেবযানি গম্ভীর হয়ে যায়। নিতান্ত কথার ছলে জিজ্ঞাসা করেঃ "কোথায় থাকেন।" ঃ "কেন বলুন

ত ?" ঃ "না এমনি বলছি ঃ" দেবেশ বুঝতে পারে না মেয়েটির মন কোন দিকে বইছে। ঃ ফুটপথে। ঃ ধ্যাৎ ওটা কি থাকার জায়গা নাকি। ওর উপর দিয়ে ত মানুষ হাটে। ঃ যেখান দিয়ে মানুষ হাটে। সেখানেই আমি শুই। দেবযানি উঠে দাঁড়ায়। —বসুন দু কাপ চা ম্যানেজ করে আনি। ও চলে যায়—দেবেশ ওর চলে যাওয়া পথে দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে—এই অবধি ভাল ভাবেই নিজেকে ঘিরে একটা রহস্যের জাল বুনে তুলেছি। এবার আস্তে আস্তে জাল ছিঁড়ে বের হতে হবে। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরায়। এক মুখ ধোঁয়া নিয়ে ফাইল বন্ধ করে পা ছড়িয়ে দেয় টেবিলের নিচেয়। চেয়ারে গা এলিয়ে দেয়। ভাবে আঠাশ বছরের দেবেশ সেন মিষ্টির দোকানের টেবিল বয় লড়ে যাচ্ছে দেবযানি চ্যাটার্জীর সাথে চৌরাসিয়া রাবারের একজিকিউটিভ অফিসারের ইমেজ নিয়ে। চালাও বাবা চালাও কে দেখছে এখানে কে সত্যি কে মিথ্যে। টেবিল বয় বলে পরিচয় দিলে দেবযানি চ্যাটার্জী নাক উঁচিয়ে চলে যেত। তার চেয়ে কিছুক্ষণের জন্যও ত মেয়েটিকে সবার থেকে আলাদা করে আনা গেছে। দেবযানি ফিরে আসে লক্ষ্য করে দেবেশ চেয়ারে হেলান দিয়ে কি যেন ভাবছে। ঃ কি ভাবছেন ? ঃ "কি বল্লে বিশ্বাস করবেন।" ঃ আহা আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসের কি আছে।" তারপর চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে খোলা পেনটা টেনে নিয়ে আপন মনে ও বলে ওঠে ঃ "আপনার এই পেনটা ত খুব সুন্দর।" দেবেশ বুঝতে পারে মেয়েটির মনে কিছু একটা হয়েছে। আবার ভাবল হয়ত আমার মন রেখে কথা বলছে। এই রকম দোটানায় ওকে উঠে বসতে হয়। চায়ের কাপে চুমুক দেয় ঃ "এর আগে এমন সুন্দর পেন আপনি কটা দেখেছেন।" ও আড়চোখে দেবেশের দিকে তাকায়। ঃ "আগে কি দেখেছি না দেখেছি তার হিসাব আপাতত করতে চাইনা। এখন কি দেখছি সেটাই বড় কথা।" দেবেশ বুঝতে পারে সব ঃ জানেন এই পেনটার একটা বিশেষত্ব হচ্ছে পেনটি

মাঝে মাঝে আড়বাঁশী হয়ে আমার হাতে সুর তোলে।" হাত বাড়িয়ে ও পেনটা ফেরৎ চায়। দেবযানি দেয় না। হঠাৎ ক্লিপটা খুলে ছেলেমানুষের মত ঠোটে রেখে ফুঁ দেয়, একটা হিস শব্দ ওঠে। দেবেশের অসম্ভব ভাল লাগে মুহূর্তটি। "পারবেন না বাজাতে" : "কেন" : মেয়েদের ক্ষেত্রে রাধার মত ঠোট হলেই তবে এ বাঁশীতে সুর ওঠে। আপনার ঠোট কি রাধিকার মত। দেবযানি আস্তে আস্তে পেনটি টেবিলে রাখে। দেবেশ চায়ে চুমুক দিয়ে খালি কাপ টেবিলে রেখে উঠে বসে ফাইল টেনে নেয় : "সবাই ত আমার ঠিকানা নিল আপনি ত জানতে চাইলেন না" : দেবেশ বুঝতে পারে জালের শেষ সুতো ও গুটিয়ে এনেছে। কিছুক্ষণ চুপ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। : "আমার কাছে একমাত্র এই প্রসারিত ডান হাতের তালু ছাড়া এমন কোন কাগজ নেই যাতে টুকে নিতে পারি আপনার নাম। দেবেশ ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। দেবযানি মৃদু হেসে ওর হাতের মধ্যে টেনে আনে দেবেশের হাত, মুহূর্তের জন্য ধরে থাকে তারপর ওরই ডট পেন দিয়ে লিখে দেয় নাম—দেবযানি চ্যাটার্জী—কলিকাতা, ১৬ই জুন। ঠিক সেই সময় মাইকে দেবদুলালের গলা শুনা যায়। বাকি সময়টুকু দেবযানি দেবেশকে ঘিরে থাকে। উইংসের পাশে এক সময় দেবযানি বলে : "এখন যদি লোড সেডিং হয় তবে আপনি কি করবেন ?" মুহূর্তের জন্য দেবযানির মুখের দিকে তাকায় দ্বিধাহীনভাবে বলে : "অন্য কিছু করার আগে আপনাকে ইলোপ করে নিয়ে পাড়ি দেব ধরাছোঁয়ার বাইরে।" দেবযানি লজ্জা পায় না স্মার্টলি বলে : "তাহলে এখনই একবার লোডশেডিং হোক।" যাওয়ার সময় দেবযানি ওর ফোন নম্বর দিয়ে বলেছিল : "আশায় থাকব ইলোপের।"

বাস থেকে জি, পি, ও-র সামনে নেমে ক্ষণিকের জন্য থমকে দাঁড়ায় দেবেশ। আশেপাশে ভালভাবে চেয়ে দেখে। পরিচিত কাউকে পায়

না। জামার গুঁজে দেওয়া অংশটা তুলে ফেলে বুকের দু' একটা বোতাম খুলে দেয়। চুলে হাত চালিয়ে খানিকটা অবিন্যস্ত করে নেয়। রেশন ব্যাগটির মধ্যে গোটা চারেক ঠোঙ্গা দোকান থেকে বেরনর সময় নিয়েছিল, টিফিন বাক্সের মত ভাঁজ করে নিতে চেয়েছিল। হয়নি, ব্যাগের পেটটা বেশ মোটা মোটা লাগছে। দ্রুত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দিকে ও এগুচ্ছে। মুখ নিচু করে। ৯—১৫ বাসের সহযাত্রীরা এখন নিশ্চয় যে যার অফিসে ঢুকে গেছে। ওদের সাথে দেখা হবেনা। একটা প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা ও ভীতির ভাব ওর মনে। ভাবছিল যদি কারও সাথে দেখা হয়ে যায় মুখোমুখি। যদি কেও চিনতে পারে। তখন কি বলবে ? এড়িয়ে যাবে কি করে ? একজিকিটিভ অফিসার অফ চৌরাসিয়া রাবারের দেবেশ সেন ডালহাউসিতে জি. পি. ও-র সামনে দিয়ে র‍্যাশন ব্যাগ নিয়ে কোথায় যাচ্ছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গেটের কাছে উঠতে গিয়ে ও থমকে দাঁড়ায়। পেছন থেকে আগত পথচারি পিঠের কাছে হুমড়ি খেতে খেতে বেঁচে যায়। ঃ "শ্যামল না, হ্যাঁ শ্যামলই ত। তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্কের মধ্যে ঢুকে গেল। আর একটু হলেই ওর সাথে মুখোমুখি হয়ে যেত। সিঁড়ি ভেঙ্গে উপর দিকে ওঠে! আশে পাশে সিকিউরিটির লোকজন। বাঁ দিকের কাউন্টারে দীর্ঘ লাইন। ডান পাশের রিভলভিং সিঁড়ি ফেলে রেখে এক প্রকার চোখ কান বুঁজে ও এগিয়ে যায় সামনের দিকে। শ্লিপ, টাকা জমা দিয়ে পিছনের দিকে তাকায় এক সময়। কাউন্টারের সামনে খোলা মেঝেয় অনেকেই বসে আছে হাত পা ছড়িয়ে। অনেকটা শিয়ালদার উদ্বাস্তুদের মত। ওদের সামনে দাঁড়িয়ে দেবেশ নিজেকে দেখল। তাড়াতাড়ি কাউন্টার থেকে পিছিয়ে এসে ওদের মাঝে বসে পড়ে। একটা থামের গায় হেলান দিয়ে চারিদিকের ছড়ান লোকজন, আর্মফোর্স, খেজুর গাছের নিচেয় সিংহের ছবিটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎই ওর হাসি পায়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে ৯-১৫ বাসে দুজনের সিটে তিনজন হয়ে রাজ্যের রাজা উজির মারার ব্যাপার স্যাপারগুলো—কবি সম্মেলনে

একটা আতলেমি ভাবসাব নিয়ে ডায়াসের পিছনে দেবযানির হাতকাটা ব্লাউজের আর সাদা সিল্কের শাড়ী দিয়ে জড়ান শরীরের আশে পাশে। ভাবে, একজিকিউটিভ অফিসার দেবেশ সেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মেঝেয় হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে কতকগুলো হিন্দুস্থানি দারওয়ানদের মাঝে। দেবেশ নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে মজা পায়।

এক সময় ও উঠে দাঁড়ায়। কাউন্টার থেকে খুচরো পয়সার ব্যাগগুলো নিয়ে র‍্যাশন ব্যাগে পোরে। ব্যাগটা বেশ ভারী হয়। কোন রকমে ডান হাতে তুলিয়ে এগোতে থাকে। নিচে নেমে হাঁপিয়ে ওঠে। বাইরের গরম হাওয়া গায়ে লাগে। চারপাশ দিয়ে দ্রুত লোকজনের চলাফেরা। বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না। রাস্তা পার হয়ে গোলদীঘিতে ঢোকার মুখে ঝোলান ব্যাগটা কাঁধের ওপর তুলে নেয়। পুকুরের পাশ দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে ওপারের মিনি বাসের টার্মিনাসের দিকে এগুতে থাকে। তাড়াতাড়ি পা চালাতে চেষ্টা করে। মনের মধ্যে একটা অজানা আশঙ্কা—একটা লজ্জাবোধ ঘিরে ধরে। কানের কাছে কারা যেন ফিসফিস করেঃ কবি দেবেস সেন—চৌরাসিয়া রাবারের দেবেশ সেন বুক খোলা জামা, অবিন্যস্ত চুল বেলবটস চড়িয়ে কাঁধে র‍্যাশন ব্যাগ নিয়ে কোথায় যাচ্ছ। শ্লা ব্লাফার, একজিকিউটিভ অফিসার—ধাপ্পাবাজ।" দেবেশ এগুচ্ছে। একটা গাছের নীচে বেশ জটলা। নিচেয় মরা পশু-পাখীর হাড় নিয়ে একজন কি যেন বলছে। পাশ দিয়ে ট্রামগুলো ওকে এড়িয়ে চলে যাচ্ছে মন্থর গতিতে দূরে। ওপারে টেলিফোন ভবনের পেছনের কোয়ার্টারের মেলে দেওয়া শাড়ীগুলো হাওয়ায় দুলছে। বাঁদিকে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সামনে পুলিশের জটলা। দেবেশ আড়চোখে চারিদিকে লক্ষ্য রেখে এগুতে এগুতে ভাবছিল—এত অসংখ্য মানুষ অফিস পাড়ায় চাকরী করে তার মধ্যে আমি কি এতই লেস কোয়ালিফায়েড ছেলে—যাকে তিন টাকার রোজের জন্য এই মোট বইতে হচ্ছে। দূর—দূর—এই কি

জীবন নাকি।

"দেবেশবাবু, দেবেশবাবু!" হঠাৎ মনে হল বহু দূর থেকে কে যেন ওকে নাম ধরে ডাকছে। ওর বুকের মধ্যে মুহূর্তে কি যেন হতে থাকে। বোঝাটা অসম্ভব ভারী মনে হয়। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগুতে চেষ্টা করে। পারে না। "দেবেশবাবু, দেবেশবাবু!" দেবেশ মুখ নীচু করে এগুতে থাকে। এক ঝলক গরম হাওয়া ওর শরীরের চারিপাশে পাক খায়। ও থমকে দাঁড়ায়। আর ঠিক সেই সময় ও লক্ষ্য করে পিছন থেকে একটা ছায়া ঘুরে এসে ওর সামনে থমকে দাঁড়ায়। ও মুখ তোলে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে—সাদা সিল্কের শাড়ী, কাঁধে ঝোলানো লেডিজ ব্যাগ, গলায় সরু চেন, হাতে বই বুকের কাছে ধরা একটা মেয়ের মুখ। আস্তে আস্তে ওর চেতনায় স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকে একটি মেয়ের নাম। দেবযানি দাঁড়িয়ে আছে আর অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে। দেবেশের বুকের মধ্যে একটা ব্যথাতুর অনুভূতি জমা হয়। ওর পা টলে ওঠে,—তাড়াতাড়ি র‍্যাশনের ব্যাগটা নামিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। "একি আপনি এখানে! দেবেশ চুপ করে থাকে কি বলবে দেবযানিকে। মুহূর্তের জন্য দেবযানি সব কিছু বুঝতে পারে। পিছন থেকে দেবযানির নাম ধরে কারা যেন ডাকে। পিছন ফিরে ও লক্ষ্য করে তিনটি মেয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। দেবেশ লক্ষ্য করে দেবযানির চোখ দুটো ক্রমশ ভিজে যাচ্ছে। শুনতে পায়ঃ "ব্লাফার —এভাবে ব্লাফ দেওয়ার কি দরকার ছিল।" ও কিছুই বলতে পারে না। তবু কিছু একটা বলতে চেষ্টা করে। "শুনুন"—কিছু শোনার থাকতে পারে না।—আপনি মিথ্যুক—জোচ্চোর—ঠগ—কি দরকার ছিল এভাবে নিজের সম্বন্ধে মিথ্যে বলা।—আপনি এতটা জঘন্য—চাপা কান্নার আওয়াজ ওর বুকে জমা হয়। দেবেশ দেবযানির দিকে একটু ঝুঁকে কিছু বলার চেষ্টা করে "শুনুন এভাবে আপনি ভুল—" দেবযানি ওর কথা শেষ হতে দেয়নি। ওকে একা ফেলে রেখে দ্রুত

পা চালিয়ে বন্ধুদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ইঙ্গিতে দেবেশের দিকে হাত বাড়িয়ে কি যেন দেখায়। তারপর ওরা হাঁটতে থাকে ট্রাম স্টপেজের দিকে। দেবেশের মনে হয় মেয়ে চারটি সবাইকে ডেকে ডেকে সতর্ক করে দিচ্ছে যেনঃ "ওখানে একটা ধাপ্পাবাজ দাঁড়িয়ে আছে। সাবধান, ওর কথা বিশ্বাস করবেন না কেউ।" যেন বলছে— "দেখুন দেখুন একটা ব্লাফারকে দেখুন।" হঠাৎই দেবেশের চোখে অজস্র আলোর রোশনাইয়ের মধ্যে নেমে আসে বুনো অন্ধকার। বুকে একটা চাপা ব্যথা অনুভব হয়। পা টলে ওঠে। এই মুহূর্তে ও ওর সমস্ত দোষ স্বীকার করেও কি যেন অজানা ব্যথায় নিজেকে পবিত্র বলে মনে করে। এক অসহায় একাকীত্বের মধ্যে ও তাকিয়ে থাকে সেই দিকে যেখান দিয়ে একটু আগে চব্বিশ নম্বর ট্রামটা বাঁক নিয়েছে। দু'হাত দিয়ে রেলিংটা চেপে ধরে, শরীরটা ঝুঁকে পড়ে, তারপর আস্তে আস্তে মুখ তোলে ডালহৌসির আকাশের দিকে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ওর মনে পড়ে ঈশ্বরের কথা— কবিতার কথা।

এখানে এই অন্ধকারে

এই দিকটা অন্ধকার। কোন আলো নেই। প্রশস্ত প্লাটফর্মের উপর এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছোট ছোট আগুনের রেখা জোনাকীর মত টিপ টিপ করে জ্বলছে। বিন্দু বিন্দু আগুনের পাশে অন্ধকার ভেদ করে অস্পষ্ট আলো ছায়ার মাঝে কারা যেন ঘোরা ফেরা করছে অদৃশ্য মানুষের মত। চারিদিকটা গাঢ় অন্ধকার। ততোধিক গাঢ় অন্ধকারে দুটো ইটের ওপর বসান পোড়া মালসার নীচটা।

স্বর্ণলতা একভাবে তাকিয়ে ছিল ফুটন্ত ভাতের দিকে। একটু দূরে অনিল ঝিমুচ্ছে। মালশার উপর বেঢপ আকৃতির একটা নকশা কাটা খুন্তির ভাঙ্গা অংশ আড়াআড়িভাবে শোয়ানো। কোলের মাঝে শীর্ণ শিশু। সরু সরু পা দুটো ঝুলে রয়েছে একদিকে। শীর্ণ একটা হাত শুকনো মাইয়ের উপর অন্য হাতটা ঝুলে রয়েছে মাটিতে। অন্ধকার জায়গাটা ঘিরে ধিক ধিক করে আগুন জ্বলছে। তিনটে উদোম বাচ্চা একভাবে লোভাতুর দৃষ্টিতে উনুন ঘিরে মালশার ফুটন্ত ভাতের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে। ইটের ফাঁক ফোকর দিয়ে মাঝে মাঝে আগুনের লিকলিকে শিখার মৃদু আলো অন্ধকারে বসে থাকা উদোম বাচ্চাগুলোর মুখের উপর নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। মালশার জল শুকিয়ে এসেছিল।

তিন জোড়া চোখের চারপাশে ক্রমশ জমাট বেঁধে উঠছিল অসংখ্য সাদা ভাতের রূপান্তরিত চেহারা। সামনের দিকে ঝুঁকে বসে স্বর্ণ ভাতটা নেড়ে চেড়ে দেখে নিতে গেলে শুকনো বুকের চাপে কোলের ছেলেটা কেঁকিয়ে উঠলো। একটা তীক্ষ্ণ কান্নার আওয়াজ আচমকা ক্ষণস্থায়ী নীরবতাকে ভেদ করতেই আগুনের পাশে বসা উদোম বাচ্চাগুলো মুখ তুলে চাইল। স্বর্ণ ভাতের মালশাটা নামিয়ে রেখে শুকনো আনাজের পাত্রটা উনুনের উপর চাপানোর সময় হঠাৎই ওর ফটিকের কথা মনে হল। গতকাল থেকে বেহুঁশ জ্বরে ঝুপড়ির মধ্যে পড়ে আছে। একটু দূরে অনিল ঝিমুচ্ছে। 'ফটিককে, একবার দেখার দরকার। কিন্তু যাই কি করে।' স্বর্ণ লক্ষ্য করল বাচ্চা তিনটে একভাবে তাকিয়ে আছে নামানো ভাতের মালশার দিকে। 'হারামির বাচ্চাগুলোর লোভ দেখি গা জ্বলি যায়। একটু উটলি পরে আর খাতি হবেনানে কারো -তিনটেই দেবেনে—।'

'ওরে ও ফটিকের বাপ উঠি একবার দেখদিনি উডা আছে না গেছে!'

অনিল ধড়মড় করে উঠে বসে। উনুনের পাশে নামানো ভাতের সাদা অস্পষ্ট চেহারার দিকে তাকিয়ে সারা দিনের ক্ষিদেটা যেন চড়াৎ করে মাথায় উঠে আসে।

'এখনও তরকারিডা হয় নাই। মাগী তোর হাতে কি ভাতার নাবছে। গতর নাড়তি পারছিসনে।'

স্বর্ণ জ্বলে ওঠে মুহূর্তে—'হ্যাঁরে হ্যাঁ, হারা জীবন ত' খাইছ একা। রাখিসনি কিছু। এখন ভাতার নাববিনানে ত' আর কি হবে। নিবা নাকি নাওসে।'

জ্বলন্ত একটা কঞ্চি উনুন থেকে টেনে এনে ছুঁড়ে দেয় অনিলের দিকে। অনিল হুড়পাড় করে সরে যেতে গিয়ে টাল খেয়ে একদিকে পড়ে যায়। আগুনটা গায়ে লাগে না। ভয়ে কেঁকিয়ে ওঠে। ছেলেগুলো বাপের অবস্থা দেখে খিল খিল করে হেসে ওঠে। অনিল চুপ মেরে বসে থাকে কিছুক্ষণ। 'প্লাটফর্ম থেকে নেবে ঝুপড়ি থেকে ফিরি আসতি

হালারা যদি ফাঁকি দিয়ে খেয়ে নেয়।' একটা অজানা আশঙ্কা ওর ক্ষুধাতুর মনের চারপাশে হেঁটে চলে বেড়ায়। ফটিকের কথা মনে পড়ে। 'তা সকালে জ্বর বাড়িছিল। ও ত' এমনিই কতবার এল গ্যাল কিন্তুক ভাত ত' রোজ—।' কি মনে করে অনিল পা বাড়ায় ঝুপড়ি মুখো। লাইন পেরোতে পেরোতে বারবার পিছনে অন্ধকার প্লাটফর্মের উপর জ্বলন্ত একটা ছোট্ট বিন্দুর দিকে ফিরে ফিরে চায়। 'হালারা খাতি পারে না উঁহু আবার অসুখের শখ। নিজি'ত দাঁত কপাটি মারি আছে সাথে আমারও আজ জুটবনানে।' সাইডিংয়ের ধার ঘেঁষে পরপর কতকগুলো ঝুপড়ি। মাটি থেকে হাত চার পাঁচ উঁচু। অন্ধকার নিস্তব্ধ। ঝুপড়ির সামনে অনিল বসে পড়ে। কুকুরের মত চার হাত পা হেঁটে কোন রকমে ঢুকে পড়ে ভেতরে। এক পাশে ছেঁড়া চট কাঁথার মাঝে ফটিকের দেহটা হাতড়াতে থাকে। গায়ে হাত ঠেকে। 'উস হালা এত ঠাণ্ডা কেন। আস্তে আস্তে বুকের ওপর চাপানো চটের থলেটা সরিয়ে হাত দেয় গায়! 'ও ফটিক, ফটিক। বাপ আমার বলি আছ ক্যামন ও ফটিক—।' একটা আশঙ্কা মনের মধ্যে বাসা বাঁধে। হুমড়ি খেয়ে বুকের উপর কান পাতে।—'নাই কোন ধুকপুকানি নাই, তবে—?' ওর ভয় হয়। 'গ্যাছে গিয়া'। হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসে। লাফ দিয়ে লাইনগুলো পার হতে থাকে। '—ফটিকের মা উডা গ্যাছে গো।' একটা তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার অন্ধকার প্লাটফর্মের মাঝে ভেসে বেড়ানো অদৃশ্য মানুষগুলোর গতিকে স্তব্ধ করে দিয়ে আরো গাঢ় অন্ধকারের মাঝে যেন মিশিয়ে দেয়। '— হায় হায় কয় কি গো—?' কোলের বাচ্চাটা ধড়ফড় করে জেগে উঠে শুকনো মাইয়ের বোঁটাটা দাঁত দিয়ে আরো জোরে কামড়ে ধরে। স্বর্ণ তাড়াতাড়ি উঠতে চেষ্টা করে পারে না। সামনের উনুনে চোখ যায়। তরকারি ফুটছে। কানা কানা বেগুনগুলো কাল চিমসে হয়ে মাছের নাড়ীভুঁড়ির সাথে জট পাকিয়ে জলের উপর ভাসছে। বাচ্চা ছেলেগুলোর লোভাতুর কাল শীর্ণ মুখের উপর হলুদ অস্পষ্ট

আলোর রেখা খেলা করে বেড়াচ্ছে। 'হায় হায় ফটিক বাপ আমার'। একটা বেদনা ব্যথাতুর অনুভূতি স্বর্ণর হৃদয়কে ভেঙ্গে দিতে চায়। অনিল হতভম্বের মত হাত পা ছড়িয়ে বসে থাকে। নির্বোধ শিশু তিনটে কিছুই বোঝে না। কেবল এক পাশে কাল মালশার মধ্যে সাদা অস্পষ্ট ভাতের আভাস স্বর্ণের করুণ মুখের উপর যেন ব্যঙ্গ করে হাসে।

'ফটিক ত মরছে এখন ইডারে নিয়ে আমি কি করি, ধারে কাছে ত কেও নাই।' আশেপাশে ঝুপড়ির অন্যান্য লোকজন সকালের দিকে উঁকি-ঝুঁকি মেরেছিল। বেলা বাড়তেই যে যার মত ধান্দায় বেরিয়েছে। স্বর্ণও বেরিয়েছে এই কিছুক্ষণ আগে। স্টেশনের এক ধারে ঝুপড়ির সামনে বেশ খানিকটা ফাঁকা জমি। ঝুপড়ির ছেলেগুলো খেলা করছে ওখানে। লাইনে কাটা পড়া একটা মরা সাপের পেছনে দড়ি বেঁধে ওর ছোট্ট ছেলেটা বার বার তেড়ে যাচ্ছে অন্য ছেলেগুলোর দিকে। জায়গাটা ঘিরে বেশ হইচই হচ্ছে। মাঝে মাঝে মৃত সাপটাকে লাইনের ওপর ফেলে রেখে ওরা দূরে দাঁড়িয়ে থাকছে। সর্টকাটে লাইন পার হয়ে ট্রেন ধরতে গিয়ে আচমকা সাপ দেখে যাত্রিরা পিছিয়ে আসতেই ছেলেগুলো হেসে হেসে এ ওর গায় ঢলে পড়ছে। কি ভেবে অনিল ঝুপড়ির মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করল। ভীষণ গরম ভেতরটা। একটা অস্পষ্ট আলোর আভায় চট দিয়ে ঢাকা ফটিকের দেহটার দিকে নজর গেল। উবু হয়ে বসে কোন রকমে ফটিকের দেহটা কোলে তুলে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু এই অবস্থায় কি করে যে বের হবে এটাই অনিল বুঝতে পারছিল না। মাথার উপর ঝুপড়ির চাল। কোন রকমে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বাইরে আসল। এরই মধ্যে ঘেমে নেয়ে গেছে। একটা ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এসে লাগে। কালো রুক্ষ চুল। চোখ দুটো আধখানা ঠোঁটের এক কোণ দিয়ে অস্পষ্ট জলের রেখা। অনিল একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। তীব্র আলো এসে পড়েছিল ফটিকের মুখে। তাড়াতাড়ি

চটের থলেটা দিয়ে ঢেকে দিল। 'শ্মশান এখান থেকে ত' অনেক দূর। ট্যাকে ত পয়সাও নাই, কি যে করুম।' কোন কুলকিনারা পায় না। তবুও অনিল ফটিকের দেহটা আড়কোলা করে তুলে নিয়ে এগুতে থাকে শ্মশানমুখো।

শহরের একপ্রান্তে নদীর ধারে অপেক্ষাকৃত নির্জন জায়গায় শ্মশান। শ্মশানে ঢোকার মুখে একটা ছোট্ট মন্দির। সামনেই একটা বটগাছ। গোড়াটা বাঁধানো। নদীর ঠিক পাড়েই পর পর চিতা। আশেপাশে কাঠ কয়লা ছড়িয়ে রয়েছে। একদল শবযাত্রী মন্দিরের সামনে একজন বৃদ্ধের মৃতদেহ নামিয়ে রেখেছে। জায়গাটা ঘিরে বেশ হইচই হচ্ছে। একটু দূরে একদল লোক মাটিতে বসে গাঁজায় দম দিচ্ছে। বটগাছের নীচেয় বাধানো চাতালে কে একজন বেহুঁশ মাতাল অবস্থায় পড়ে আছে। চাতালের এক ধারে মাটিতে ফটিকের দেহটা রেখে চুপচাপ উবু হয়ে বসে অনিল দেখছে সবকিছু। লোকজন যে যার কাজে ব্যস্ত। হাতাহাতি করে বয়ে আনা হচ্ছে কাঠ। একজন বয়স্ক লোক চাতালের উপর শুয়ে থাকা বেহুঁশ লোকটাকে ডেকে তুল্লো। চোখ দুটো লাল। লোকটা কি যেন বলতেই বেহুঁশ লোকটা দু হাত তুলে দশটা আঙ্গুল মেলে ধরল। বয়স্ক লোকটা কোন কথা না বলে দশ টাকা ট্যাক থেকে বের করে ওর হাতে দিতেই কোন রকমে ও টলতে টলতে চিতার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সবাইকে সরিয়ে দিয়ে বয়ে আনা কাঠগুলো নিপুণ ভাবে চিতার উপর সাজিয়ে দিতে থাকল। অনিল বুঝল এই হচ্ছে শ্মশানের ডোম। মাতাল লোকটাকে ফিরে আসতে দেখে অনিল তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল ওর দিকে।

"—ছ্যাহেন ভাই ইডারে ত' মাটি দিতে হব। ব্যবস্থা ট্যবস্থা কিছু কইরা দেন।"

লোকটা অনিলের দিকে তাকিয়ে কথাটা অনুধাবন করার চেষ্টা করল। তারপর হাত তুলে পাঁচটা আঙ্গুল তুলে ধরল ওর সামনে।

"—উইস হালা কয় কি ! পাঁচটা পয়সা নাই ত' পাঁচটা ট্যাকা। অনিল পিছিয়ে আসল এক পা। লোকটা অনিলকে পাশ কাটিয়ে টলতে টলতে চাতালের কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ল আবার। অনিল বসে বসে ভাবছিল কি করে। 'একটা কুদাল টুদাল থাকলি পরে, নিজেই না হয় মাটি দেওয়া যেত। কিন্তুক কুদালই-বা পাই কনে' অসহায় ভাবে ফটিকের পাশে বসে অনিল আবোল তাবোল কথা ভাবে—"হায়রে আমার বাপ কি যে করি এখন কওদিনি, এখন তোরে নিয়া আমি কোথায় যামু। মইরা তুই আমায় এত কষ্ট দিতাছ ক্যান।"

একটা বিরক্তি, একটা অজানা ব্যথা অনিলকে আরো বেশী অসহায় করে তোলে। চারদিকে আতিপাঁতি করে চোখ বোলায়- -কোথাও কুদাল কিছু নাই। ক্রমশ একটা চাপা রাগ জমা হতে থাকে ওর মনে। 'হারামির বাচ্চাগুলানের তাপ উত্তাপ আছে কিছু। ভাইডারে নিয়ে আমি মরতাছি আর ওগুলো কেমন মজা মারে মরা সাপ নিয়া খেলছে।' কি ভেবে অনিল চটের আশপাশটা ভাল করে গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর ফটিকের দেহটা ফেলে রেখে দ্রুতই বেরিয়ে যায় ঝুপড়িমুখো।

কোদাল পায়নি অনিল। ফাঁকা ঝুপড়িতে এখন কেউ নেই। 'কি যে করি—লাইনের ওপারে বাবুগো বাড়িতে থাকতি পারে। কিন্তুক দিবে কেন আমায়।' চুপাচাপ বসে আছে অনিল। ভেতরে ভেতরে ছটফট করছে ওর মন। 'ফটিকের পাশে ত কেউ নাই। একা ফেলে রেখে এসেছি কি যে করি।' অসহায়ের মত আশেপাশে কি যেন খুঁজতে থাকে। হঠাৎই ঝুপড়ির চালের দিকে ওর নজর পড়ে। কাল, মালশার পাশে আধভাঙ্গা বেঢপ আকৃতির একটা খুন্তি। তলার মুখটা বেশ পুরু। অনিল মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়ে চালের ওপর থেকে টেনে আনল ওটা। কোন কিছুর ভাবার ফুরসতই পেলনা। এক প্রকার পাগলের মতই ও ছুটতে থাকল শ্মশানমুখো।

নদীর পাড় থেকে বেশ খানিকটা নেমে আসল ও। পাড়ের কোল ঘেঁষে কারা বোধ হয় মাটি নেবার জন্য বেশ কিছুটা জমি খুঁড়ে রেখেছিল। অনিল এই জায়গাটাই বেছে নিল। নরম মাটির ঝুর ঝুরে অংশের এক ধারে ও বসে পড়ল। চারিদিকটা নির্জন। মরা নদীর মরা জল। ওপারে একটা পরিত্যক্ত ইট ভাঁটা। নদীর কোল থেকে চিতা দেখা না গেলেও ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। দু একজনের অস্পষ্ট কথা হাওয়ায় ভেসে ভেসে আসছে। মাঝে মাঝে ফট ফট করে আওয়াজ হচ্ছে কাঠ ফাটার। তারপর আবার সেই নির্জনতায় ডুব দিচ্ছে চারপাশ। বেশ খানিকটা মাটি তুলে ফেল্ল অনিল। হাতের তালু জ্বলে যাচ্ছে। বেশী জোর দিতে পারেনা। একটা অজানা আশঙ্কা ভেসে বেড়ায় মনে। স্বর্ণের কথা মনে আসে— বড় সখের খুন্তি এটা। যদি বেঁকে যায়। হাত দুটো টন টন করছে। মাঝে মাঝে থেমে নিয়ে ভাল করে আঙ্গুল দিয়ে দেখে নিচ্ছে ফলার ধারটা ভোঁতা হয়নি। আঙ্গুলের নখের চারপাশে অসাড় হয়ে এসেছে। বেশ কিছুক্ষণ পর অনিল উঠে দাঁড়াল। একটু দূরে ফটিকের দেহটা চটের থলে দিয়ে ঢাকা। কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে চটটা সরিয়ে নিয়ে দু'হাতে জড় করে নদীর জলে ভাসাতে গিয়েও কি ভেবে থেমে যায়। ফেলে রাখে মাটিতে। নীচু হয়ে ফটিকের দেহ আড়কোল করে তোলার সময় একটা ভ্যাপসা গন্ধ ওর নাকে এসে লাগে। শরীর গুলিয়ে ওঠে মুহূর্তে। গর্তের মধ্যে আস্তে আস্তে নামিয়ে দেয়। গর্তের দু ধারে ডাঁই করা মাটি দু হাত দিয়ে টেনে এনে চাপা দেবার মুহূর্তে থমকে দাঁড়ায়। এই প্রথম ফটিকের জন্য ওর মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ওর চোখের চারপাশে গতকাল রাতে ফটিকের না খাওয়া ভাতের অংশে ওর ভাগ বসানোর কথা মনে পড়ে। তাড়াতাড়ি ও মাটি ফেলতে থাকে গর্তের মধ্যে। একসময় গর্ত্তটা মিলিয়ে যায় মাটির সমান্তরাল রেখায়। আশেপাশের ঝোপঝাড় থেকে ডাল পালা ভেঙ্গে এনে- বিছিয়ে দেয় গর্তের উপর তারপর অবসন্ন দেহে খুন্তিটা হাতে করে ও ঘাটের দিকে পা বাড়ায়।

বেশ পরিষ্কার করে ঘসে ঘসে খুন্তিটা থেকে অনিল মাটি তুলতে থাকে। খুন্তির আগাটা যেন একটু বাঁকা বাঁকা মনে হয়। ঘাটের সিঁড়িতে খুন্তিটা রেখে ভাল করে হাত পা কচলায়। কানে মুখে জল দেয়। কুলকুচি করে। হঠাৎই হাতের তালু থেকে কেমন যেন একটা গন্ধ ওর নাকে লাগে। মুহূর্তে চোখ যায় হাতের তালুর দিকে। পরিষ্কার। তবুও ভাল করে হাত ধোয়। কচলায়। নাকের কাছে আনে। ফের সেইরকম একটা ভ্যাপসা গন্ধ। আবার জলে হাত ডোবায়। তোলে। নাকের কাছে আনে। গন্ধ পায়। অনিল পাগলের মত ঝপ করে জলের মধ্যে হাত চুবিয়ে ঝিম মেরে বসে থাকে। এক সময় হাত বাড়িয়ে খুন্তিটা ও টেনে আনে। পরখ করার জন্য নাকের কাছে ধরে। আবার ঠিক তেমনিই যেন একটা ভ্যাপসা গন্ধ ওর নাকে লাগে। খুন্তি সমেত ঝিম মেরে জলের মধ্যে অনিল বসে থাকে কিছুক্ষণ। রোদের তেজ ক্রমশ কমে আসছে। দূরে চিতার আগুন স্তিমিত। অনিল বেশ কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে জল থেকে উঠে দাঁড়াল। পাড়ের ওপর চটের থলেটা রয়েছে ওটা নিল। তারপর পরম মমতায় একবার ডান দিকে একটু দূরে সেই ছোট্ট কবরটার দিকে তাকিয়ে প্রাণ ভরে এক বুক নিশ্বাস নিল এবং কি আশ্চর্য মুহূর্তের জন্য একদলা ভাতের সুবাসিত গন্ধ যেন ওর নাকের চারপাশে ঘোরাফেরা করল।

অনিল ভ্যাপসা গন্ধের মধ্যে ফটিকের যে অস্তিত্ব কিছুক্ষণ আগেও পেয়েছিল এই মুহূর্তে শক্ত মাটির ওপর দাঁড়িয়ে এক বুক নিশ্বাস নিতে গিয়ে সর্বপ্রথম বাতাসে সাদা ভাতের সুবাসিত গন্ধে হারিয়ে ফেলল নিজেকে।



খেলা শুধু খেলা

"রোজ সকালে রাস্তায় ছোটাছুটি বন্ধ কর। পরীক্ষা হয়ে গেছে কাজের ধান্দায় লেগে পড়। ওসব খেলাধূলা দিয়ে পেট ভরবে না বুঝলি।"

সত্যব্রত নদীতে স্নানে যাওয়ার সময় বাবার কথাগুলো শুনে থমকে দাঁড়ালো। ঘরের দাওয়াতে বসে বিড়ি টানছিল ওর বাবা। বাড়ীর সামনেটা আগাছা জঙ্গলে ভরে গেছে। বহুদিনের পুরানো বাতাবী লেবু গাছটায় আর ফুল ধরে না তেমন। একটা অথর্ব জবুথবু। সত্যব্রত বাবার মুখের দিকে তাকায়। রুক্ষ মলিন ভাব। রাগ হয় বাবার কথা শুনে। তবু এই মুহূর্তে নদীর ঘাটে এক দঙ্গল ছেলের সাথে ভাসমান কাঠের পুল থেকে নদীর জলে ঝাঁপানোর তীব্র নেশা ওকে টানতে থাকে নদীমুখো। কোন কথা বলে না। আড়বাঁশে ঝোলানো ভিজে গামছাটা নিতে হাত বাড়ানোর সময় ঘরের চালের দিকে ভাঙ্গা টালির ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে এক চিলতে নীল আকাশ। সত্যব্রত ছুটতে থাকে নদীমুখো।

গাছের পাতার বিস্তৃতি দিয়ে ঘেরা এই মফঃস্বল টাউনে সত্যব্রতর সাথে আছে মাঠ কোঠা, লোকজন, সারি সারি দোকান, সবুজ মাঠ, নির্জন প্রান্তর আর মসৃণ পিচের রাস্তার ধারে বিশাল বিশাল শিশু

গাছের ছায়া সুনিবিড় পথ ; আর আছে ছানাকাটা জলের মত স্বচ্ছ নদী ইছামতী আর তার দুপাশের উদাসী বনমর্মর। সত্যব্রত রোজ খুব ভোরে যখন সমস্ত প্রকৃতি এক নিঝুম আবেশে ভোরের রূপালী ছায়া নিয়ে ঢেকে রাখে এই শহর তখন সেই বিশাল শিশু গাছের ছায়া সুনিবিড় পথ বেয়ে শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক নির্জন প্রান্তে ছুটে যাওয়া আসা করে। সেই সময় ওর মনে হয় এ শহর বুঝি কোন এক অদৃশ্য যাদুকর তার রূপোর কাঠি দিয়ে পাষাণপুরীর মত নিস্তব্ধ করে রেখেছে। কোথাও কোন লোকজন নেই, নেই কোন প্রাণের স্পন্দন। রাস্তার দু'ধারে বাড়ী ঘর দোকান পাট দূরে দূরে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত গাছগাছালি ছোট ছোট মাঠ কোঠা সব যেন কেমন নিঝুম। কোন লোকজন নেই, শুধু গোটা অঞ্চলটা জুড়ে শত শতাব্দীর নির্জনতা ঘিরে থাকে। অথচ ভোরের আকাশে যখন সূর্যের আলো ফোটে তখন কোথায় সেই নীরবতা! যেন কিছুক্ষণের দেখাটাই সম্পূর্ণ ভুল। রাস্তা দিয়ে চলে মানুষ, মানুষের সাথে পথটি যেন ছোটে শহরমুখো। মেয়েরা স্কুলে যায়। বাস লরী টেম্পো ছোটে। কে বলবে এ শহর কিছুক্ষণ আগেও মৃত পাষাণপুরীর মত নিস্তব্ধ নিষ্প্রাণ ছিল। শহরের যে প্রান্তে সত্যব্রতরা থাকে সেখান থেকে সুখপুকুর প্রায় পৌণে দু'মাইল। রোজ এতটা পথ ও দৌড়ে যাতায়াত করে। খুব ভোরে পূর্ব দিগন্তে যখন আবছা একটা ফিকে আলোর রেখা দেখা যায় ঠিক সে সময় হাফ্‌প্যান্ট পরে পায়ে কেট স আর গেঞ্জী গায়ে দিয়ে সত্যব্রত রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। ছুটতে থাকে সুখপুকুর মুখো। ওর চলার ছন্দে একটা ক্ষীণ শব্দ উঠে নির্জনতাকে ক্ষণে ক্ষণে ভেঙ্গে দেয়। পথের দু'ধারে সারি সারি বাড়ী ঘরদোর দোকান পাট মাঠ-ময়দান তখন ঘুমন্ত অবস্থায় সরে সরে যায়। ওদের বাড়ীর সামনে পিচের রাস্তার ধারে দুটো বিরাট পুকুর। এ জায়গাটাকে দীঘির পাড় বলে। পীচের রাস্তাটা দীঘির পাড় দিয়ে সোজা দূরে বেশ খানিকটা এগিয়েই একদম অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘুরে গেছে শহরের অপর

প্রান্ত দিয়ে সুখপুকুরের দিকে।

সত্যব্রত রোজ এই বাঁকের মুখে এসে একবার পিছন ফিরে চায়। পেরিয়ে আসা পরিচিত পরিবেশটা একটা স্থির চিত্রপটে আঁকা ছবির মত মুহূর্তে ভেসে ওঠে চোখে। আবছা ফিকে নীল আলোর মধ্যে ভেসে ওঠে রাস্তার ধারে ওদের বাড়ির পাঁচিল। পাঁচিলের গায়ে লাইটপোষ্ট আর পোষ্টের ধারে পর পর কতকগুলো ছোট ছোট দোকান পাশেই মল্লিক বাড়ীর বিশাল কম্পাউণ্ড ফিকে হলুদ রঙের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা মল্লিক বাড়ীর পাঁচিলের লাগোয়া একটি লিচু গাছ আর পরপর কতকগুলো সুপুরি গাছের ঝাড় নিয়ে বেশ খানিকটা ফাঁকা জমি ওর চোখে ভেসে ওঠে। এখান থেকে ও ক্রমশঃ ঢুকে যাচ্ছে শহরের অপেক্ষাকৃত ঘিঞ্জি অঞ্চল বাজারের সারি সারি দোকান বাসষ্ট্যাণ্ড রিক্সাষ্ট্যাণ্ডের পাশ দিয়ে ক্রমশঃ শহরের পরিচিত পরিবেশ থেকে অপরিচিত নির্জন প্রান্তের দিকে।

সত্যব্রত এক নাগাড়ে দৌড়ে এসে হাঁপিয়ে ওঠে। গেট পার হয়ে পাশের ছোট্ট চালা ঘরটা উঁকি দেয়। ভোরের আবছা আলোয় চারপাশটায় আলো আঁধারি খেলা। চারপাশে বাহারী ফুলের ঢল গাছ ঝোপ ঝাড়। গেট থেকে সোজা পশ্চিমমুখো ইটের রাস্তার তু'পাশে অসংখ্য ছোট ছোট দোপাটির চারা বাগানের ভেতর অবধি চলে গেছে। সোজা যতদূর দেখা যায় নানান ফুলের গাছ। এখন সময়টা হেমন্তের। সবুজ ঘাসের বুক থেকে শুরু করে দোপাটি শিউলি কাঠমল্লিকা টগর গোলাপ যে দিকে তাকাও সেই দিকেই শুধু রাত-ভোর শিশিরের আনাগোনা। স্বচ্ছ ক্ষীণ আলোর রেখার মাঝে নিস্তব্ধ এই ফুলবাগানে ও সোনালালকে খুঁজতে থাকে।

'—কি গো খোকাবাবু, আজ যে দেরী বড়, ফিরবে কখন গো ?'

আচমকা সোনালালকে একটা গোলাপ ঝাড়ের পাশে মাটিতে উবু হয়ে বসে কাজ করতে দেখে।

সত্যব্রত একলাফে দোপাটির সারিবদ্ধতাকে ডিঙ্গিয়ে অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গায় এসে পড়ে। সোনালাল হাসতে থাকে—খোকাবাবু এ তোমার খেলার মাঠ নয় গো। সবে ঘুম ভাঙ্গছে গাছগুলোর, অমন দৌড় ঝাঁপ নয়।'

সোনালালের কথায় সত্যব্রত মজা পায়। হাত বাড়িয়ে ফুটে থাকা কয়েকটি গোলাপ ফুল তুলতে গিয়ে ওকে থামতে হয়।

'—উঁহু, ওটি হবে না গো খোকাবাবু, ওটি হবে না। অন্য ফুল নিতে পারো, গোলাপ নয়।' সত্যব্রতর রাগ হয়—'আহা, তুমি কত ফুলই ত' দাও। লাল গোলাপ একদিনও দিলে না।' একটা অভিমান ফুটে ওঠে ওর মুখে। সোনালাল হা-হা করে হেসে ওঠে। বলে—'ওগুলো যে কেউ নিতে পারে না গো। ওতে কাঁটা আছে যে। আর তা বাদে এত পথ তুমি কষ্ট করে কি করে নিয়ে যাবে। কাঁটা ফুটে তোমার হাত থেকে যদি ওগুলো রাস্তায় পড়ে যায়! দেখছো 'ত কত কষ্ট করে এমন রক্তের মত সব লাল গোলাপগুলোকে যত্ন করে রেখেছি—।' সত্যব্রত কোন কথা বলে না। চুপচাপ সরে আসে। আড় চোখে সোনালালকে দেখে। সোনালাল উঠে দাঁড়ায়। ভোরের আলো ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

এই ক্ষীণ আলোর মধ্যে দু হাতে ভিজে মাটির স্পর্শ। একহাতে ছোট্ট নিড়েন মাথায় মাফলার নিকষকালো গায়ের রঙের মধ্যে হাতকাটা গেঞ্জি গায় সোনালালকে চারিপাশের শিশির সিক্ত ভোরের মাঝে অদ্ভুত স্বপ্নরাজ্যের যাদুকরের মত মনে হচ্ছে। ওরা দুজনে বাগানের গেটের দিকে এগুতে থাকে। চলতে চলতে সোনালাল হাত বাড়িয়ে এগাছ ওগাছ থেকে ফুল তুলতে তুলতে কথা বলে—'খোকাবাবু তোমার খেলা কবে শুরু হবে। পারবে 'ত মেডেল নিতে।'

সত্যব্রত থমকে দাঁড়ায়। হঠাৎই বাবার মুখটা ভেসে ওঠে 'কি জানি, ভাবছি এসব ছেড়েছুড়ে দেব।'

'কেন গো এইতো বয়স গো।'

সত্যব্রত হাত বাড়িয়ে একটা পাতাবাহারী গাছ থেকে কয়েকটি হলুদ পাতা ছিঁড়ে নিয়ে কি যেন দেখতে থাকে। 'বাবা পছন্দ করেন না এই সব। ফ্যাক্টরীতে কি সব গণ্ডগোল লেগেছে। বাড়ী এসে শুধু বলবে কাজটাজ দেখ। খেলাধূলা ছাড়।' হঠাৎ সোনালালকে ওর আপন বলে মনে হয়, বলে,—'আচ্ছা সোনালাল খেলাধূলা ছেড়ে দিলেই কি পেট ভরবে না এখনই আমাকে কেউ কাজটাজ দেবে।' সোনালাল চুপ করে থাকে। শুধু ডাল থেকে ছিঁড়ে নেওয়া ফুলগুলো দিয়ে ইতিমধ্যেই একটা সুন্দর ফুলের তোড়া তৈরী করে ফেলেছে ওটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে ওঠে—'আমি আর কি বলব বল? আমি মুখ্যুসুখ্যু লোক।'

ওরা দু'জনে বেশ খানিকটা পথ চুপচাপ কোন কথা না বলেই এগিয়ে গেল। হঠাৎই সত্যব্রত পাশ ফিরে দেখল সোনালাল নীচু হয়ে কতকগুলো শুকনো ডাল এক জায়গায় জড়ো করে তুলে নিয়ে আপন মনে কি যেন বলছে। চারিপাশে অখণ্ড নীরবতার মাঝেও শুনতে পেল—'আমি এত কষ্ট করে ফুলের বাগানে ফুল ফুটাই। তা সব ফুল কি দেবতার পায়ে পড়ে? পড়ে না, পড়ে না। কতক ঝরে যায় কতক আজেবাজে লোক নিয়ে যায়। আবার কতক কুঁড়ি অবস্থায় শুকিয়ে যায়। যদি সব ফুল ফুটতে পারত 'ত দেখতে গো খোকাবাবু, আমাদের সংসার কত সুন্দর হত।'

ওরা হাঁটতে হাঁটতে বাগানের গেটের কাছে পৌঁছে যায়। চারিপাশের অন্ধকার ক্রমশঃ কেটে যাচ্ছে। নিথর পরিবেশটা ঘুমভাঙা পাখীদের কলরবে ক্রমশঃ চঞ্চল হয়ে উঠছে। পূর্ব দিগন্তে লাল একটা আভা ছড়িয়ে পড়ছে। সত্যব্রত পূব দিকে চাইল। দেখল ভোরের সূর্যটা দিগন্তের কাছাকাছি মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। ছাইরঙের মেঘের চারিপাশ দিয়ে সূর্যের লাল ছটা আপ্রাণ চেষ্টা করছে তার পূর্ণ রূপ নিয়ে বিকশিত হতে পারছে না। সত্যব্রত মুখ ফিরিয়ে নেয়। ফুলের তোড়াটা গেঞ্জির মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে কেমন যেন বিষণ্ন

মনে মাথা নীচু করে খুব ধীরে ধীরে ছুটতে থাকে শহরমুখো।

'হেই ইয়াংম্যান, হেই ইয়াংম্যান।' সমস্ত নির্জনতাকে ভেঙ্গে খান-খান করে দিয়ে এই নির্জন কুয়াশাসিক্ত ভোরে কার যেন ভরাট গলার আওয়াজ ভেসে ওঠে। সত্যব্রত থমকে দাঁড়ায়। চারিপাশ কুয়াশায় ভরা একহাত দূরের কোন ছবিও স্পষ্ট চোখে পড়ে না। পিচের রাস্তা কেমন যেন ভিজে ভিজে চারিদিক ভাল করে লক্ষ্য করে। যে জায়গাটুকুতে ও দাঁড়িয়ে আছে সেইটুকু জায়গার পরিধি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। বাড়ী ঘর মাঠ ময়দান সবকিছুই একটা ছাইরঙের মেঘের মধ্যে ডুবে গেছে। মাঝে মাঝে কুয়াশার ঘনত্ব স্বচ্ছ হয়ে আচমকা পারিপার্শ্বিক সবকিছু চোখে ভেসে ওঠে। আবার মুহূর্তে সবকিছু মেঘের রাজ্যে যেন ডুবে যায়। সত্যব্রত ছুটতে চায় পায়ের কেট্‌স স্কিড করে যায়। ও থমকে দাঁড়ায়। সহসা ওর সামনে হাত পাঁচেক দূরত্বে রাস্তার ধারে শিশুগাছের গোড়ায় আচমকা এক বৃদ্ধের অবয়ব ফুটে ওঠে। বিশাল একটা পুলওভাব গায়, হাতে লাঠি। ঠিক তার পাশে লাল হলুদ ছোপ ছোপ কার্ডিগান পরা একটি মেয়ে একটি বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দৃশ্যটা ক্ষণিকের জন্য স্থির হয়। কোথা থেকে সহসা একরাশ কুয়াশা এসে ঢেকে দেয় ওদের মাঝখানের ফাঁকা হাত পাঁচেক জায়গাটুকুকে। সত্যব্রতকে কে যেন টুপ করে আবার মেঘের রাজ্যে ভাসিয়ে দেয়। ক্রমশঃ কলহাস্যময় একটি মেয়েলি গলা ও তার সাথে বৃদ্ধের হা—হা—হাসি চারপাশের নিথর পরিবেশটাকে সহসা শিমুল তুলোর মত হালকা হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়। কিছুই চোখে পড়ে না। সহসা কে যেন ওকে সপাটে তু'হাত দিয়ে জাপটে ধরে। 'দেন এটলাষ্ট উই হ্যাভ ক্যাপচারড় য়্যু। হা -হা –।' বৃদ্ধের তু'হাতের মধ্যে পড়ে ও হাঁপাতে থাকে। পূর্ব দিগন্ত ফরসা হয়ে আসছে ক্রমশঃ। কুয়াশা কেটে পারিপার্শ্বিক দৃশ্যগুলো ভেসে উঠছে। একটা আবছা আলোর

মধ্যে সত্যব্রত দেখে মেয়েটি ভাসা ভাসা চোখে অনন্ত বিস্ময় নিয়ে ওকে দেখছে। কোথা থেকে একঝাঁক লজ্জা এসে ওকে নুইয়ে দেয়। কোন রকমে বৃদ্ধের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় ও।

—দেন, তুমিই তাহলে রোজ ভোরে পায়ের ছাপ রেখে যাও রাস্তায়।' বৃদ্ধ সত্যব্রতর কাঁধে তার বিশাল হাত রেখে জিজ্ঞাসা করেন। তারপর কথার তোড়ে নিজেই ভেসে গেলেন। এক সময় নিজেই নিজের পরিচয় দিলেন। '--আমায় চিনতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। হবেই'ত আমি মল্লিক বাড়িতে থাকি। এটি আমার নাতনী নবনীতা আর এটি নবনীতার ভাই। খুব ভোরে ওঠা আমার অভ্যেস। ওটি আমি আর্মি থেকেই সংগ্রহ করে এনেছি। তোমাদের ডাঃ মল্লিক হচ্ছে আমার ছেলে।' সত্যব্রত সবকিছুই বুঝতে পারে। বৃদ্ধ তাহলে মল্লিক বাড়ীর বড় কর্তা। উনিই তাহলে কোলকাতায় থাকেন। আর্মির খুব বড় ডাক্তার ছিলেন। ডাঃ মল্লিকের মেয়ে বেথুনে পড়ে। থাকে হোষ্টেলে। মাঝে মাঝে এসে থাকত। কালো ছিপছিপে দোহারা চেহারা বাড়ীর সামনের লনে বেতের চেয়ারে বসে থকেতে দেখা যেত ওকে। ওবাড়ীর একটা আলাদা আভিজাত্য ছিল যার সীমানা ডিঙিয়ে ওদের সাথে মেশা সত্যব্রতদের কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হ'ত। ঠিক এই মুহূর্তে এত কাছে ওদের সান্নিধ্য ওকে আড়ষ্ট করে তুলছিল। তবুও বৃদ্ধের সহজ সরল কথাবার্তাগুলো ওকে সহজ করে তুলছে। '—আপনি এদিকে রোজ ভোরে কোথায় যান', সহসা মেয়েটি ওকে প্রশ্ন করলে সত্যব্রত সহজ হয়ে উত্তর দিতে কিছুতেই পারছিল না। চারিপাশটা ফর্সা হয়ে গেছে। কুয়াশার ঘনত্ব কেটে যাচ্ছে ক্রমশ। রাস্তার কোলে শিশুগাছের গোড়ায় কয়েকটি ফুল পড়েছিল। সত্যব্রত ওদের নজর থেকে সরিয়ে নিয়ে সহজ হওয়ার জন্যই নীচু হয়ে ফুল দুটো তুলে নিল। সরু সরু হলুদ রেণু মাখা পাঁপড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে বল্লে—'আমি সুখপুকুর অবধি দৌড়ে যাই।'

—কেন?

—বারে সকালে উঠে প্র্যাক্‌টিস করতে হবে না! আমার ডিষ্ট্রিক্ট স্পোর্টস'ত সামনেই।
বৃদ্ধ সহসা ওর কাঁধ তুটো ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলে উঠল '—তুমি তাহলে স্পোর্টসম্যান। বাঃ বাঃ দেখছিস নবনীতা দেখ দেখ আমার থেকেও কেউ কেউ তাহলে আগে ওঠে।' ওরা চলতে শুরু করল '—জান আমরা রাস্তায় বেরিয়েই রোজ দেখতাম কয়েক জোড়া ভিজে পায়ের ছাপ বেশ কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে মিলিয়ে গেছে। কিছুতেই ধরতে পারতাম না কার পায়ের ছাপ। শেষে আমার এই মহিলা ডিটেকটিভটি আমাদের গতি পথ পরিবর্তন করে তোমার এদিকে নিয়ে আসল এবং তুমি ধরা পড়লে।' ওরা একসাথে খুব ধীরে ধীরে হাঁটছিল। আকাশ এখন সম্পুর্ণ পরিস্কার। চারিপাশের কুয়াশা নেই বললেই চলে। রাস্তার তু'ধারে নির্জন মাঠ ময়দান দূরের বনবীথি গাছপালা সব কেমন যেন নিঝুম আবেশে ঘুমিয়ে আছে। সত্যব্রত ভাবছিল আজ দেরী হয়ে যাবে ফিরতে। হঠাৎ নবনীতা ওর কাছে সরে এসে বল্লে '—আপনি আমাদের বাড়ীতে আসুন না একদিন' সত্যব্রত দাঁড়িয়ে পড়ল। কি যেন ভাবল। বৃদ্ধ নাতনীর কথার সুর ধরে বলে ওঠে '—হ্যা-হ্যা অফ কোর্স আসবে। এবার থেকে আমরা রোজ সকালে এদিকে আসব, কি বলিস নব ?'
'—আহা, তা কি করে হবে! ও তো ছুটতে ছুটতে যাবে। ওর স্টেপিং এর সাথে আমরা কি করে পা মেলাব।' নবনীতা সত্যব্রতর মুখের দিকে চায়।
সত্যব্রত কোন উত্তর দেয় না। ফুল তুটো সহসা ও বাড়িয়ে দেয় বাচ্চাটির দিকে। বাছুরের মত নিস্পাপ চোখ নিয়ে বাচ্চাটি থপ থপ করে এগিয়ে আসে ওরদিকে তারপর হাত বাড়িয়ে দেয়। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা কাঠবিড়ালী রাস্তার একধার থেকে আর একধারে দ্রুত ছুটে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে তিড়িক করে লেজটা নাড়াতেই বাচ্চাটি সত্যব্রতর কাছ থেকে সরে গিয়ে ধরতে চায়; পারে না। টালখেয়ে

মাটিতে পড়ার মুখেই সত্যব্রত ঝুপ করে নীচু হয়ে কোলে তুলে নেয়। বাচ্চাটা কাঠবিড়ালীটার দিকে হাত বাড়িয়ে কি যেন বলতে চায় বোঝা যায় না। ঠিক সেই মুহূর্তে ওর ফোলা মুখ ঠোঁট উল্‌টানো ভাব আর চোখের কোণে ভোরের নিস্তব্ধ নিয়রের মত টল টলে জলের ছবিটি দেখে ওরা হেসে ওঠে একসাথে। সহসা বাচ্চাটিকে ওর কোল থেকে নিয়ে বৃদ্ধ দু'হাতে ছুঁড়ে দেয় ওপরের দিকে তারপর সুনিপুণ হাতে লুফে নিয়ে বলে '—ব্যাটা এতটুকু পথ হাঁটতে পড়ে যাও আর দেখ'ত এই আরে কি বলে ডাকব তোমায়। নামটাই তো বল্লে না।

সত্যব্রত নাম বলে।

'সত্যব্রত, সত্যব্রত, গুড্ দেখছিস নব, সত্যই যার ব্রত সে ত জিতবেই কি হে।' সত্যব্রত লজ্জা পায়। কোন রকমে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে ও ছুটতে থাকে শহরমুখো। পূর্বদিগন্তে তখন সূর্য উঠেছে। শান্ত পরিবেশটি ক্রমশ চঞ্চল হয়ে উঠছে সেই সাথে চঞ্চল হয়ে উঠছে সত্যব্রতর মন। কারণ বেলা হয়ে গেলে বাজারে যাওয়ার দেরী হয়ে যাবে, ঠিক সময় ফ্যাক্টরীতে ভাত পাবে না বাবা।

'শনিবার আমি চলে যাচ্ছি ব্রত। তুমি চিঠি দিয়ে জানাবে তোমার রেজাল্ট কি হ'ল।'

'সেদিন ভোরে সুখপুকুর থেকে ফেরার পথে ফুলের তোড়াটি নবনীতাকে দেবার সময় ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সূর্য ওঠেনি তখনও। মল্লিক বাড়ীর গেটের সামনে খোলা লনের সবুজ জাজিমের ওপর শুধু পড়েছিল রাতের শিশির। সেদিন ভোরের বাতাস ছিল আর্দ্র। আগে'ত এমন মনে হত না। অথচ কেন জানি না এখন কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয় রাস্তাটা। সামনের রাস্তা একাকী নীরব। দু'পাশে শিশুগাছের ছায়া। আর দিগন্ত বিস্তৃত উদাসী বাউলের মত মাঠ ময়দানকে সাক্ষী রেখে সত্যব্রত ছুটছে সুখপুকুরমুখো। ক্রমশ ওর গতি বাড়ছে। শীত জমিয়ে পড়েছে। মাঠ ঘাট গাছপালা

সবকিছু শিশিরের ভিজে পরশে সিক্ত। বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়া। কানের দু'পাশে সোঁ সোঁ আওয়াজ। নির্জন রাস্তায় ওর পায়ের ছন্দে উঠছে শব্দ। মাথা ঈষৎ ঝুঁকিয়ে ও ছুটছে। কালো পীচের রাস্তা ছুটে যাচ্ছে পিছন দিকে। দূরে কালভার্টটা দেখা যাচ্ছে। ওখানে আর কেউ নেই। অথচ গত বেশ কয়টি দিনে কালভার্টের কাছাকাছি হলেই ভোরের রূপালী আলোর মধ্যে দেখা যেত নবনীতাকে একাকী বসে আছে। দু'পাশে হাওয়া সরে যায়। বাতাস থেকে ভেসে আসে কার যেন চুপি চুপি কথা।

—বাব্বা কতক্ষণ বসে আছি, কখন ফিরব!

—এই'ত এক্ষুণি, আর একটু বস। আমি সোনালালের সাথে দেখা করেই চলে আসব এক্ষুণি। হ্যাঁ।' ছুটছে; সত্যব্রত ছুটছে। দ্রুত দ্রুত। ক্রমশ ওর গতি বাড়ছে। আর যতই ওর গতি বাড়ছে ততই ওর পাশ দিয়ে হাওয়ার অলিন্দ বেয়ে কে যেন চুপি চুপি কথা কইছে।

—আমি চলে যাচ্ছি সত্যব্রত।

—কেন?

—বারে আমার কলেজ খুলছে না।

ছুটছে; সত্যব্রত ছুটছে। সূর্য এখনও ওঠে নি। চারপাশ এখনও অন্ধকার। রাস্তার পাশের একটা গাছ থেকে ডানা ঝাপ্‌টিয়ে নাম না জানা একটা পাখী দ্রুত ছিটকে উড়ে গেল। সত্যব্রত ক্ষণিকের জন্য মুখ তুলল। এখনও অনেকটা পথ সুখপুকুর।

—তুমি পারবে'ত জিততে।

—দেখি।

—আমি কাগজে দেখব তোমার নাম। ফটো। তুমি অনেক বড় হবে। দেশ দেশান্তরে ঘুরবে। তোমাকে পারতেই হবে সত্যব্রত। পথ সরে সরে যায়। সামনে শুধু কালো রাস্তা। কেউ কোথাও নেই। কেন জানি না হাঁপ ধরে যায়। এমন'ত হয় না। হাত দুটো মুঠো

করা। হাওয়ায় কনকনে ভাব। দূরের শিমূলগাছটা পার হলেই সোনালালের বাগান। এখনই দম ফুরিয়ে গেলে ফিরব কেমন করে।

'—খোকা তুই জানিস কাল তোর বাবার ফ্যাক্টরী বন্ধ হয়ে গেছে।'

সত্যব্রত ছুটছে। আগামী রোববার ওর ফাইন্যাল স্পোর্টস। এখন এসব চিন্তা কেন? ও ভাবছে।

'—এবার হ'ল তো। তোকে বলিনি কাজটাজ দেখ, খেলাধুলো ছাড়। এখন কি খাবি বল?'

ছুটছে, সত্যব্রত ছুটছে।

'—বাবা তুমি আমায় একটুখানি সময় দাও—বাবা—লক্ষ্মীটি।'

অন্ধকার কেটে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। পাখীদের কলরবে ফিরে আসছে দিন। দূরে দেখা যাচ্ছে সোনালালের বাগান। শিমূল গাছ পার হয়ে ও এসে পড়ে বাগানের গেটের কাছে। গেটটা খোলা। দম নিচ্ছে সত্যব্রত। 'অনেক কথা আছে সোনালাল, অনেক কথা আছে তোমার সাথে।' কিন্তু কোথায় সোনালাল! গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকতেই ও থমকে দাঁড়ায়। চারিপাশে নিঝুম ফুলের ঘুম জড়ানো ছায়া। কেন জানি না গা-টা ছম্ ছম্ করে। হঠাৎই অন্ধকার ভেদ করে সোনালাল অদ্ভুত নিঃশব্দে ওর সামনে এসে দাঁড়ায়। সোনালাল হাসছে। নিকষ কালো শরীর। মাথায় সেই পুরাণো মাফ্‌লার জড়ানো। সাদা গেঞ্জি হাঁটুর ওপর মালকোঁচা মারা ধুতি শুধু আজ ওর হাতে ডালশুদ্ধু ভেঙ্গে নেওয়া বেশ কয়েকটা তাজা রক্তগোলাপ। সত্যব্রত এগিয়ে আসে ওর কাছে। কথা বলতে গিয়ে থামতে হয়।

'—খোকাবাবু আজ আমার তাড়া আছে গো এক্ষুনি বেরুতে হবে।'

সত্যব্রত নিভে যায় মুহূর্তে। সোনালাল লক্ষ্য করে। কোন কথা বলে না। ওরা ফিরতে থাকে গেটমুখো। রাস্তায় উঠে এসে মুখ তোলে। ভোরের আলোর সাথে ভেসে ওঠে সোনালালের হাসি। শক্ত হাতের মধ্যে টেনে নেয় সত্যব্রতর হাত। বলে, 'এই দেখ

খোকাবাবু আজ তোমায় কি দিচ্ছি দেখ গোলাপের তোড়া। কি সুন্দর না? কেমন রক্তের মত লাল। দেখ সাবধানে নিয়ে যেও বাপু ওতে কাঁটা আছে। হাতে ফুটে যেন রাস্তায় না পড়ে যায়। কাল এসো কথা কইব গো।'

গাছের পাতার বুনটের মধ্যে দিয়ে ফিরে আসে আর একটা দিন। আকাশ তার কালো রাতের মলিনতা মুছিয়ে দিয়ে নিয়ে আসছে আগামী দিনের শুভ্রতাকে। সোনালাল পিছন ফেরে। কেবল ফেলে রেখে যায় সামনের কঠিন রাস্তায় একাকী সত্যব্রতকে।

এখন সত্যব্রত ছুটছে আবার। হাতের মধ্যে ধরা রয়েছে রক্তিম গোলাপ। ওতে কাঁটা আছে। হাতে ফুটছে তবুও ও কিছুতেই হাত ছাড়া করবে না ওগুলোকে। ধীরে ধীরে আলো ফুটে উঠছে। সামনের নির্জনতা কেটে যাচ্ছে। ক্রমশ শহরের লোকালয় দেখা যাচ্ছে। ছুটছে, সত্যব্রত ছুটছে। মুখ উঁচু করে ছুটছে এবারও। ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যেও ঘেমে উঠছে ও। দম পাচ্ছে না আর তবুও কেন জানি না আজ কি এক অজানা তাগিদায় ফিরে পেতে চাইছে বুনো বাইসনের গতি। হাতের মধ্যে এখনও ধরা আছে কাঁটাবিদ্ধ রক্ত গোলাপ। রাস্তার বাঁ পাশের দিগন্তের কাছাকাছি সূর্যের রক্তিম আভার মত ফুলগুলোকে মনে হচ্ছে। দূরে মাঠে কতকগুলো কৃষক রমণী ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে আরো দূরে। সত্যব্রত এগিয়ে চলেছে। সকাল হচ্ছে ক্রমশ। মানুষের ঘুম ভাঙ্গছে। আর যত বেশি অন্ধকার ভেঙ্গে ঘুম ভাঙ্গছে লোকালয়ের, ততই ওর ছোটার গতি বাড়ছে। এক সময় খেয়াল হয় শহরের মধ্যে ও ঢুকে পড়েছে। এসে পড়েছে ঠিক সেই বাঁকটার মুখে যেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যেত ওদের বাড়ী, মল্লিকদের বাগান। বাঁকের মুখে এসে আজও হঠাৎ মুখ তুলে দেখতে চায়। ভোরের আলো এখন তেমন স্পষ্ট হয়নি। অস্পষ্ট আলো ছায়ার মধ্যে হঠাৎ ওর যেন মনে হয় ওদের বাড়ীর

বিবর্ণ পাঁচিলের ধারে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। ঈষৎ নুইয়ে পড়া একটি শীর্ণ মানুষের অবয়ব। ছুটছে সত্যব্রত। ক্রমশ ছবিটি যেন চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গিয়ে ভেসে উঠছে একটি মেয়ের মুখ। ছুটছে সত্যব্রত। দম যেন ফুরিয়ে আসতে চায়। হাঁটু ভেঙ্গে আসছে ক্লান্তিতে। সারা শরীর ঘেমে গেছে। হাতে গোলাপের কাঁটা ফুটে কষ্ট হচ্ছে। তবুও ছুটতে চায় '—আর'ত মাত্র এতটুকু পথ।' সত্যব্রত আবার মুখ তোলে। ক্রমশ চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে সব কিছু। পরিবর্তে ভেসে উঠছে বারবার একটি মানুষের মুখ, শরীর। ঠিক যেন ওর বাবার বিষণ্ণ মুখের মত। আর ঠিক তখনি ওর মনে হল এতটুকু পথ বোধহয় আর পার হওয়া যাবে না। '—কিছুতেই না। পারতেই হবে তোমাকে সত্যব্রত। জিততেই হবে তোমাকে। আর'ত মাত্র এটুকু পথ। দৌড়ও সত্যব্রত, ছোট, থেমনা। গলা শুকিয়ে আসছে। কানের মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করছে। সমস্ত শরীর ঘেমে ভেসে যাচ্ছে। তবু ও ছুটছে। '—ছোট খোকাবাবু ছোট। দৌড় দাও। আর'ত মাত্র এটুকু পথ—।' সেই মুহূর্তে কে যেন অবিকল সোনালালের মত গলায় বলে উঠল। সত্যব্রত হাতের দিকে চাইল সাথে সাথে। ওখানে কেবল লাল রঙের মত গোলাপ। বিপরীত দিক থেকে হাওয়ার দাপটে কাঁপছে ওর পাঁপড়িগুলো। সত্যব্রতর এই প্রথম মনে হল ওগুলো গোলাপের পাঁপড়ি নয়। ক্রমশ চোখের সামনে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছিল পাঁপড়িগুলো লাল পতাকায়। যেন হাওয়ায় পত পত করে উড়ছে। আর কেন জানিনা সেই মুহূর্তে সত্যব্রত ভাবল ও পৌঁছিয়ে যাবেই এইটুকু পথ। আর পথ পার হয়েই, প্রথমেই বিবর্ণ পাঁচিলের গায়ে হাত দিয়ে বলে উঠবে, 'ভয় কি বাবা, এই দেখ আমি এসে গেছি।'

অবসাদ কাটিয়ে উঠি

ঘাসের জাজিমের ওপর শুয়ে নরেন তাকিয়ে ছিল আকাশের দিকে। জ্যোৎস্নার নীলাভা ঝরছিল সমস্ত প্রান্তরে। অসংখ্য তারার সমাবেশ মুখোরিত এ সন্ধ্যায় বার বার উচ্চারিত হচ্ছিল একটি প্রশ্ন ওর মনে :—"এ সব-য়ের মালিক কে ?

দোচালা টালির ছাওনি। চাঁচের বেড়ার গায়ে লতিয়ে ওঠা পুই-গাছের সবুজ রঙ আর তার সাথে ফলন্ত আমগাছের নুইয়ে পড়া ঠাসা পাতার বিস্তৃতি দিয়ে ঘেরা দো-কাঠা জমি নিয়েই নরেনের জগৎ গড়ে উঠেছিল। পাকাঠির বেড়া ঘেরা এক ফালি জমি বাড়ীর সামনে নিরবে শুয়ে ছিল অসংখ্য ঘাস বুকে নিয়ে। শহরের শেষ প্রান্ত, যেখান থেকে শুরু হয়েছে গ্রামের আদিগন্ত প্রসারিত মাঠ, সেই আলের জালে জড়িয়ে থাকা রুক্ষ মাটি ওর পূবের জানালার কাছে এসে থেমেছিল। একটা সাবেকী আমলের চারপাই কিছু ছেড়া তোষক, একগাদা মাটির হাড়ি-কলসি-ঘুটের বস্তা, ছুচোর গর্ত ভরা মাটির মেঝের উপর নড়বড়ে টেবিলে গাদা মরা বই আর মরচে পড়া হেরিকেন নিয়েই নরেনের সংসার।

মাটির দাওয়াই-য়ের পশ্চিম দিকে উনুনের উপর বসান ছিল মাটির

হাঁড়ি। বাঁশের খুটিতে জ্বলছে একটা ছোট্ট কুপি। ফুটন্ত ভাতের ভাব উঠছিল হলদে অস্পষ্ট আলোর মধ্য দিয়ে। পাশে মাটির সরাইয়ের উপর কতকগুলো শুকন আনাজ কেটে রাখছিল নরেনের মা। নরেন সব কিছুই লক্ষ্য করছিল। এই মুহূর্তে একটা অস্পস্ট বেদনা ওর বুকে এসে ধাক্কা মারল। কিছুক্ষনের জন্য বেসামাল হয়ে পড়ল ও। '—এই ভাবে শুধু ভাত আর শুকনো আনাজ খেয়েই কি কেটে যাবে জীবন। '—জীবন কি অন্য কিছু পোত পারে না।' নরেন ভাবল। তেইশের তরতাজা শরীর ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। '—কি হবে শুধু শুধু কয়েকটি ডিগ্রী সম্বল করে ব্যর্থ আশার পেছনে ছুটে।' বার বার শুধু কতগুলো প্রশ্ন তোলপাড় করছিল ওর মনে অথচ ইয়াসিন তার কড়া পড়া হাতের মুঠোর মধ্যে নরেনের হাত দুটো চেপে ধরেছিল একদিন। সেদিন মানুষের জীবনের অনেক কথা শুনিয়েছিল ও। আর কি আশ্চর্য্য সেদিন এক মুহূর্তেও মনে হয়নি এই ইয়াসিনের কথা ভাবতে হবে একদিন। ইয়াসিন আলি নরেনকে একদিন বুঝিয়েছিল কি ভাবে মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। গঙ্গার বুক থেকে হাওয়া বইছিল দুরন্ত বেগে। নরেনের পরিপাটি করে আচড়ান চুল বেসামাল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল মুখের ওপর। মেঘলা আকাশের বুকে বিদ্যুৎ উঠেছিল চমকিয়ে। ভেসে উঠেছিল ওপারের অসংখ্য বাড়ী ঘর কলকারখানা। ষ্টিমারের একটানা গুরু-গম্ভীর আওয়াজ কি এক বেদনা-বিধূর যন্ত্রনায় কেঁদে কেঁদে উঠছিল দুলে উঠেছিল জেটিগুলো। তিন টাকা রোজের ইয়াসিন আলীর গায় ছিল তেলচিটে পড়া খাকি সার্ট, অথচ কি নির্ভিক আত্ম-প্রত্যয়ে ভরা। ওর পাচ ফুট আট ইঞ্চি দেহ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল এক দুরন্ত প্রেরণা। 'এই ভাবে পুরোন দুনিয়াটা ভেঙ্গে পড়ে। আর সেই ভাঙ্গাচুরো দুনিয়ার ওপর গড়ে ওঠে আমাদের নিজস্ব সংসার।

' নরেন তুই ত শিক্ষিত ছেলে। আমি আর তোকে কি বোঝাব বল। এই ভাবে নিজেকে শেষ করে ফেলিস না।' ওর গলার শব্দ, বলার

ভঙ্গির মধ্যে এক অদ্ভুত সম্মোহন শক্তি ছিল যা নরেনকে ক্রমশ অভিভূত করে ফেলেছিল।

নরেন নিজেকে নিয়ে ভাবছিল। ওর প্রাত্যহিক দরিদ্রতার মধ্যে বেড়ে ওঠা জীবন, ভূয়ো শিক্ষার বড়াই, মেকি সভ্যতার প্রতিযোগিতায় মার খেয়ে হতাশ হয়েছে। কলকাতার য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে এসে ও ভেবেছে অনেক কথা। চৌরঙ্গীর সন্ধ্যায় মারকারির আলোয় ও স্বপ্ন দেখত অনেককিছু। সেই স্বপ্নগুলো ওর দোচালা টালির ছাদ আর বেড়া ঘেরা ঘরের পরিবর্তে গ্রীল ঘেরা বাড়ীতে মানিপ্ল্যান্ট আর ফ্লাওয়ার ভাসে ফুটিয়ে তুলত সিজ্জিন ফুল। ঘাসের জাজিমের উপর বানাত হলদে নুড়ির পথ। যার বুক চিরে গো-গো গগল্‌স পরে 'ভেসপা' চড়ে সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরত ও। ঝোলান ভারী পর্দা ঠেলে তখন মা বাইরে বেরিয়ে এসে বলত '—এসেছিস খোকা।' নরেন নিরুত্তর থেকে মায়ের পাশ কাটিয়ে দাঁড়াত মণিকার সামনে, একপলক তাকাত। কিন্তু অবাস্তব স্বার্থপরের মত স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। সত্য এটাই যে তেইশের যুবক নরেন এক মাইল মেঠ পথ পেরিয়ে সেদ্ধ খেয়ে কলকাতার দিকে ছুটত সেই সকালে। দিনের শেষে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে কড় কড় ভাত খেয়ে এলিয়ে পড়ত বিছানায়। আগাছায় ভরে থাকত বাড়ীর সামনের হাসিটুকু নোংরা থাকত ঘর, মেজাজ থাকত রুক্ষ। এই ভাবে নরেন বাস্তব জীবন আর কাল্পনিক স্বপ্ন প্রত্যহ লড়াই করে অবসাদগ্রস্থ করে তুলছিল ওকে। ক্রমশ নরেন তার ইপ্সিত বাসনার হাতছানিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। '—এ রকম করে বাচা যায় না। ঘর নেই দোর নেই দুটো বন্ধু-বান্ধব আনা যায় না নোংরা আবর্জনা একগাদা জঙ্গল এই কি জীবন নাকি।' সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে মার সাথে কি এক কথায় ও চেঁচিয়ে উঠেছিল মা ওর দিকে তাকিয়ে ছিলেন কিছুক্ষণ তারপর জলের ঘটি টেবিলের উপর রেখে ঘর ছেড়ে বাইরে গিয়ে দাওয়ায় বসে বলেছিলেন '—তা বাপু আবর্জনা আর আগাছাগুলো 'ত ঝেটিয়ে বিদেয় করলেই পারিস।

তোর ঘর দোর তুই যদি ময়লা করে রাখিস 'ত কষ্ট তুই পাবি। আমার আর কি।' একটু থেমে বলেছিলেন 'নিজের ঘর নিজেকে তৈরী করে নিতে হয় খোকা। কি অদ্ভুত সেদিন নরেন বুঝিনি কি নিগূঢ় সত্য লুকিয়ে ছিল মার কথার মধ্যে। অথচ ইয়াসিন যখন কথা প্রসঙ্গে বল্লে 'সমাজের এই লোকগুলো যারা আমার তোর করিম মিঞার মত মানুষের ঘাড়ে বসে মুনাফার পাহাড় জমিয়ে আমাদের ঠেলে দিয়েছে অন্ধকারের মধ্যে তাদের তুই যদি কিছু না বলিস তবে তোকে 'ত কষ্ট পেতেই হবে বন্ধু।' নরেন ইয়াসিনের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। ইয়াসিন আরো কাছে সরে এসে বলেছিল '—হ্যাঁ তুই বিশ্বাস কর নরেন, তোর সমাজ তোকেই তৈরী করে নিতে হবে। সেদিন বুঝতে পারিনি নরেন আজ বারবার মার কথাগুলো মনে পড়ছে, মনে পড়ছে ইয়াসিন আলির কথা। মনে হচ্ছে দূরের ওই অসংখ্য নক্ষত্রগুলো যেন ইয়াসিনকে চেনে। এই অনন্ত মহাকাশ থেকে যেন ওরা ইয়াসিনকে বলছে '—কমরেড এই বিশ্ব তোমাদের তোমরাই একে বানিয়ে নাও।' কিন্তু কোথায় ইয়াসিন, এই মুহূর্তে ইয়াসিনের বড় প্রয়োজন। আদিগন্ত মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে নরেন চীৎকার করে বলতে চাইল যেন 'ইয়াসিন তুমি হারিয়ে গেলে কেন। কেন ফেলে গেলে আমায় একা এখানে'। দূরের আকাশে একটা তারা খসে পড়ল। চলমান নক্ষত্রটি একটা আলোর রেখা আঁকিয়ে তুললে। হারিয়ে যাওয়ার সময় যেন নরেন দেখতে পেল ইয়াসিন আলি হাসছে। বহুদূর থেকে অতি পরিচিত ভরাট গলার আওয়াজ যেন ভেসে আসছে। কে যেন অতি দরদ ভরা গলা বলে চলেছে। 'We will meet again, my friends we wi!l meet again. Together we will lough at the sun, Together we will fight. Oh friends in struggle, br‹ thers in work, Comrades farewell.'

কুয়োর ধারে বেড়ে ওঠা নলী ঘাসের সবুজ শীষের মত বেড়ে ওঠেছিল মণিকা নরেনের মনের মধ্যে। রঙ্গিণ রামধনুর সাতরঙি স্বপ্নের মত

মণিকা নরেনের আশেপাশে ঘিরে থাকত সব সময়। মণিকার চোখে ছিল ঘর বাঁধার স্বপ্ন। অথচ এই অসহ্য আবর্জনাময় সমাজের কোথাও ওদের জন্য এতটুকু জায়গা নেই যেখানে ওরা বাঁধতে পারে ওদের নিজস্ব ঘর। জন-মজুর করিম মিঞার বুকফাটা কান্না এখনও ঘুমের মধ্যে নরেনের কানে বাজে। ও মাঝে মাঝে গভীর রাতে পূবের জানলা দিয়ে দিগন্ত প্রসারিত রুক্ষ ফাটা চৌচির মাটির দিকে তাকিয়ে ভাবে '--কেন এমন হয়?। কেন করিমের বিবি তার ছেলে দুটো ফলিডল খেয়ে মরে?। কেন করিমের বউ একদলা আটাও জোগাড় করতে পারে না? কেন?। কেন?। ইথারের মধ্য দিয়ে নির্জন প্রান্তর বেয়ে ছড়িয়ে পরে নরেনের এই জিজ্ঞাসা। 'হয়না মণিকা, হয়না। এই ভাবে জীবনকে মেনে নেওয়া যায় না।' গঙ্গার তীরে এমনি সন্ধ্যায় নরেন মণিকাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। কারণ ও দেখেছে বিশ্বের অন্য প্রান্তরের অসংখ্য মণিকাকে, করিমকে। দেখেছে জীবনকে অন্য রূপে গ্রহণ করতে। দেখেছে এক পরিপূর্ণ যৌবনকে, যারা রক্তিম পতাকা মেলে ধরেছে অন্ধকারকে মুছে দিতে। কেমন করে ওরা বুনো অন্ধকারের পরিবর্তে এনেছে সূর্যের রক্তিম আভা তাও দেখেছে। '—এই বিশ্বের নীল সামিয়ানার নিচেয় দাঁড়িয়ে ওরা ডাকছে। মণিকা, এ ডাকে সাড়া না দিয়ে দাসত্ব করা অসম্ভব।'

নরেন স্বপ্ন দেখে এখন অন্যভাবে। ও করিমকে বুঝিয়েছে ইয়াসিনের প্রদর্শিত পথে যেতে হবে। মণিকাকে মিছিলে সামিল হতে বলেছে। ঘাসের জাজিমের ওপর শুয়ে ও এখন ভাবে '—আমি রুক্ষ ফাটা জমির আল মুছে দেব। আমি আমার ফ্যাকাশে যৌবনকে পরিপূর্ণ তাজা কর'ব। আর সমাজের আগাছাগুলোর গোড়া ধরে উপড়িয়ে আন'ব। তারপর গড়'ব সেই জগৎ, যেখানে নদীর উদ্দাম ঢেউয়ের বুকে ঝাপিয়ে পড়'ব আমরা। সোনালী ধানের শীষে মুখ রেখে ভালবাসা জানাব আমরা মাটিকে। আকাশের নীল সামিয়ানার

তলায় দাঁড়িয়ে মেঘরাশীকে জানাব আমার বার্তা। অসংখ্য নক্ষত্র পুঞ্জের হাত দিয়ে পাঠাব আমার ভ্রাতৃপ্রতিম সেই দেশগুলিতে বিজয় বার্তা যারা আমায় অন্ধকার মুছে দিয়ে উড়াতে বলেছিল রক্তিম সূর্যানুর মধ্যে লাল পতাকা।

নাগরদোলার চালক

সমীরণ রাস্তায় নেমে আসে।

মাথার ওপরে গনগনে আকাশ। বাতাসে রৌদ্রের গন্ধের সঙ্গে আরও যেন কিছু মিশে রয়েছে।

মানুষের দীর্ঘ মিছিল চলে যায়। চলে যায় রুক্ষ মানুষের মিছিল। খালি পায়ের মিছিল যায় চলে। তারই মাঝে সারা অঙ্গে সিফিলিস নিয়ে কিছু মানুষ শয়তান, সমাজের রক্তে ছড়িয়ে দিতে চায় বিষাক্ত ভাইরাস।

সমীরণের সেই লাইনটার কথা মনে পড়ে যায়, 'দ্য প্যাথস অব গ্লোরি লীড বাট টু দি গ্রেভ।' হাজার চেষ্টা করেও সে লেখকের নামটা মনে করতে পারে না। তার হাসি পায় ওদের অনিবার্য পরিণতির কথা ভেবে। হাসলে সমীরণের মুখের চারপাশে উজ্জ্বল কতকগুলি রেখা আঁকা হয়ে থাকে।

এই সমস্ত কথা ভাবলে ওর মনে হয় পরিচিত অপরিচিত মুখগুলি অস্পষ্ট কুয়াশায় ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে।

ওর মনে হয় সবই গতিশীল।

এই রাস্তায় লোকজন, বাড়ীঘর, মিছিল, পেটের জন্য যুদ্ধ, অনাহারে

মৃত্যু, আবার নিয়নের নীচে কলকাতার মুখ, হরতাল, লাঠিচার্জ, সব কিছুই শব্দহীন নীরবতায় ডুবে যায়। শব্দহীন নীরব অথচ প্রাণময় চঞ্চল সবকিছু। মাঝে মাঝে কলেজের এই রাস্তায় ও যখন হাঁটতে থাকে তখন প্রায় মনে হয় একটা অদ্ভুত জিনিস। রাস্তার ধারের দুপাশে আকাশ ছোঁয়া বাড়ীগুলোর দিকে তাকিয়ে ও দেখে দরজা জানলা রেলিং সব সব কিছুই ঠিক আছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য প্রত্যেক জায়গায় ও যেন দেখতে পায় একটা উলঙ্গ মানুষ সমস্ত দেহে বিষাক্ত ঘা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যার মুখ আছে অথচ চোখ নেই, আঙুল হাঁসের পায়েব মত জোড়া। বুক আছে ফুসফুস হীন। পেট নেই অথচ প্রচণ্ড খিদে, যৌনাঙ্গ আছে যা দগদগে ঘায়ে ভরা। বেশীক্ষণ তাকাতে পারে না। কি এক অজানা আতঙ্কে ওব শরীর ঘেমে যায়। মনে হয় ওকে বুঝি এই বিষাক্ত বাড়ীর লোকগুলোর বিচ্ছিরী ছোঁয়াচে রোগ ঘিরে ধরবে। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড হাঁপিয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ঐ আকাশ ছোঁয়া বাড়ীগুলোর ছায়া থেকে দূরে চলে যায়। যত তাড়াতাড়ি পারে রাস্তা পার হয়ে যায় এক নিঃশ্বাসে। অথচ ও লক্ষ্য করছে কত লোকইত ওর সাথে একই ভাবে চলে যাচ্ছে স্বচ্ছন্দে। সন্দেহ হয়, লোকগুলো বোধহয় আমারই মত ছোঁয়াচে রোগ থেকে বাঁচার জন্য এক নিঃশ্বাসে পার হয়ে যাচ্ছে ঐ আকাশ ছোঁয়া বাড়ীগুলোর ছায়া থেকে দূরে এই রোদ জাগানো রাস্তায়।

এক ঝলক রোদের মাঝে ও আবার ফিরে আসে নিজের মধ্যে। সাবলীল ভঙ্গীতে ঝোলান কাঁধের ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে মুখের ঘাম মোছে। আস্তে আস্তে চলতে থাকে। কিছুক্ষণ আগের ঐ দৃশ্য মুহূর্তে মিলিয়ে যায় মন থেকে।

একদিন স্বপ্নের মধ্যে সমীরণ দেখেছিল সেই কলেজে যাবার রাস্তার ধারে বিরাট বাড়ীগুলোর ওপর বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ ঝরে যেন ঝরে পড়ছে। বাড়ীগুলো ভেঙে পড়ছে।

সঙ্গমরত মানুষগুলো শেষবারের মত মিটিয়ে রক্ত শুষছে। তারপর

নাবল' ঝমঝম করে বৃষ্টি।

বাড়ীগুলোর পলেস্তরা বরষায় ধুয়ে ধুয়ে পূন্যতোয়া গঙ্গায় ভেসে যাচ্ছিল শবদেহের মত।

আর তার মধ্যে একটা নিস্পাপ শিশুমুখ বরষার জল পেয়ে বেড়ে ওঠা নলি ঘাসের মত মাথা নাড়াচ্ছিল আনন্দে।

এই স্বপ্নের কথা সমীরণ নরেনকে বলেছিল।

নরেনের মুখ পাল্টে যাচ্ছিল। শেষে খুব গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'এটাই নিয়ম ; পুরানো দুনিয়াটা এই ভাবেই ভেঙে যায়'।

রোদ্দুর ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আছছিল।

ঘাসের উপর চিৎ হয়ে শুয়েছিল সমীরণ। নরেন পাশে বসে গভীর ভাবে কিছু ভাবছিল।

এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে মঞ্জু এল।

'বাব্বা আপনারা এখানে, আমি'ত মনে বরলাম মনুমেণ্টের ময়দানে আপনারা শহীদ হতে চলে গেছেন।'

সমীরণ বিরক্ত হল। ঘাসের উপর পাশ ফিরে শু'ল। বলল, কিন্তু আহ্লাদী তোমার খবর কি।

সমীরণ দেখল মঞ্জুর চোখ আরক্ত। মুখটা লাল হয়ে উঠেছে মঞ্জুকে ও ভাল ভাবে জানে। বড়লোকের মেয়েদের মত উন্নাসিক। ন্যাকা ন্যাকা। কখনও একট উদ্ধত। শরীর দিয়ে কথা বলে। বৃষ্টি ছুপিয়ে আসে মেহেন্দীর আলপনায়।

স্বাভাবিক হতে মঞ্জু খানিক সময় নিল। বলল, 'এই আপনারা যে কোন দিন আসুন না আমাদের বাড়ীতে'।

সমীরণ তাকাল, ওর চোখে সন্দেহ।

মঞ্জুর গলায় কোন উদ্বেগ খুঁজে পাওয়া গেল না।

নরেন বলল, 'যাবো তবে কথা দিচ্ছি এমন নয় কিন্তু'।

মঞ্জু চলে যেতেই নরেন বলল, 'কালকে'ত ছুটি আছে না সমীরণ' ?

হ্যাঁ।

এক কাজ কর তুই নটার মধ্যে ওদের বাড়ীতে চলে যাস। আমি একটু দেরী করে যাব। মঞ্জুকে যা হয় একটা কিছু বলে দিস তবে সাবধান; আমার মনে হয় মঞ্জু একটা অসাধারণ ঝুঁকি নিতে চলেছে। ও শেষ একটা কামড় দিতে চায়।

সবুজ লন পেরিয়ে যেতে গিয়ে লক্ষ্য করল সমীরণ সেই মানুষটার মত দগদগে ঘা নিয়ে ম্যানসনটা ওকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

দারোয়ান বলল, 'এহি হ্যায় মিসি বাবাকা রুম।'

তাকাল।

দারোয়ান হাসল—বুকের কাছে মাথাটাকে নুইয়ে।

সমীরণ ঘরের ভিতর পা দিল। দরজার জানালা সঙ্গে ম্যাচ করানো বেড কভার, সোফার কভার। ফ্লাওয়ারভাসের ভিতর ফুটে আছে রজনী গন্ধা। ঘরের ওপাশে ট্যাপের শব্দ হচ্ছে। কেমন যেন ভয় ভয় করছিল সমীরণের। বেড কভারের উপর পড়েছিল একটা বই। সমীরণ বইটা ওল্টাল। 'চের ডায়েরী'।

বলিভিয়ার জঙ্গলে ধরা পড়ার পর চে'র যে ডায়েরী পাওয়া যায় তারই অনুবাদ। বইটা সমীরণের পড়া। বইটা মুড়ে সমীরণ উঠে দাঁড়াল। এ্যাটাচড বাথরুমের দরজা খুলে গেল।

সমীরণ দেখল মঞ্জুর সমস্ত সোমত্ত শরীর থেকে চুইয়ে পড়ছে জল। ভীষণ একটা ভয়ে ভিতরের হৃদপিণ্ড থেমে গেল। সমীরণ দেখল পর্দাগুলো বাতাসের শিস শুনে সাপের মত দুলছে। সাপগুলো যেন সমস্ত বেড কভারে অসংখ্য সংখ্যায় কিলবিল করছে। তারা নেমে সমীরণের সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। হাত দিয়ে সে যেন ওগুলোকে ফেলে দিতে চাইছে অথচ পারছে না।

কে যেন তাকে সম্মোহন করে একে একে খুলে নিচ্ছে তার পোষাক। ঘরের ভিতর মানুষ সমান আয়নায় সে দেখল সেই ফুসফুসহীন, যৌনাঙ্গে

দগদগে ঘায়ের লোকটার মুখের মত তার মুখটা বীভৎস হয়ে উঠছে।

সমীরণ চীৎকার করে মঞ্জুকে আঁকড়িয়ে ধরল।

পালঙ্কের নমনীয়তার মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল সমীয়ণ।

মঞ্জু শরীর মেলে কথা বলল। তার শরীর মোমের মত গলে গলে ঝরে পড়ছিল।

ঘোলাটে চোখে সমীরণ চাইল। বাইরের রোদ কে যেন চুরি করে নিয়েছে। ওর বুকের রোদ চুরি হয়ে যাচ্ছিল।

ওর মনে হ'ল কুয়াশায় ভাসতে ভাসতে খালি পায়ের মানুষের মিছিল সাদা সেই বাড়ীর পায়ের কাছে নতজানু প্রার্থনায় সুখ ভিক্ষা করছে।

সে না, না, করে চীৎকার করে উঠল।

জেতার আনন্দে মঞ্জু নিজেকে মেলে দিল।

সমীরণ দেখল নরেনের মুখটা ক্রমশঃ ধূসর হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

সে বিড় বিড় করে বলতে চাইল, 'নরেন আমায় তুই বাঁচা নরেন, আমায় বাঁচা'।

ক্রমশঃ চোরাবালির মধ্যে ডুবে যাচ্ছে ভেবে সে হাত বাড়াল। প্রসারিত হাতের ধাক্কা খেয়ে 'চে'র ডায়েরী'-টা খুলে যেতেই বেরিয়ে পড়ল চের মুখ।

বিষাক্ত ঘরের হাওয়া ছেড়ে বেরিয়ে এল সে। চের ডায়েরীটা ওর হাতে। সাদা বাড়ীর জন্য এই সব বই নয়।

বাইরে কিসের মেলা।

নাগর দোলায় সবাই ঘুরছে।

সমীরণ ভাবল এই নাগর দোলার মানুষ কেউ কেউ থাকবে না শেষ দিনে। কেউ কেউ ছিটকে পড়বেই।

থাকবে এই নাগর দোলার চালক ঐ খালি পা, রুক্ষ মাথার নেংটি পরা মানুষ।

অনেক পরে মেলা ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। সমীরণ নাগর দোলার চালকের

পায়ের কাছে হাঁটু গেঁড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, আমায় ক্ষমা করে দাও একবার, একবার অন্তত তোমাদের কাছে বিশ্বাসী হবার সুযোগ দাও।

তার চোখ থেকে জল ঝরছিল নেংটি পরা, রুক্ষ মাথার খালি পায়ের উপর।

দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের দিকে

সাময়িক বিরতি। আপাততঃ দৃশ্যগুলো ঘটছেনা। তার মানে এই নয় যে দৃশ্যগুলো আর দেখা যাবেনা। যেহেতু সব কিছু পাল্টিয়ে গেছে, একটি সম্ভাবনাময় ঘটনা অন্যরূপ নিয়েছে সেইহেতু যে প্রকৃত ঘটনাগুলো ঘটবেনা এমন ভাবার বোধ হয় সময় আসেনি। তাই—

অনিমেশ ফিরছে। দীর্ঘ সাত বছর পর।

ধূ-ধূ মাঠের মাঝে একফালি পরিত্যক্ত রাস্তার মাঝ দিয়ে টানা ভ্যান রিক্সার উপর বসে অনিমেশ ফিরছিল। যতদূর চোখ যায় শুধু ফাঁকা মাঠ। রুক্ষ। মাইলের পর মাইল শুধু অনাবাদী জমি। যতদূর চোখ যায় শুধু দারিদ্র্যের মলিন রূপ। এখানকার জমিতে বছরে শুধু একবার ফসল হয় তাও প্রকৃতির করুণ কৃপায়। নদীর জল লোনা। মাটির বহু গভীরে যে জল তা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। এখানে প্রকৃতি আর গুটিকয় মানুষ নির্বিবাদে অসংখ্য মানুষকে ব্যাঙ্গ করে চলেছে বিশাল ঐশ্বর্য্যের মুখোশে। ফাঁকা মাঠের উপর চৈত্রের রোদের লেলিহান শিখা দিগন্তের কাছাকাছি নেচে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে হাওয়া দিচ্ছে। ধূলো কুণ্ডলী পাকিয়ে মাঠের এক ধার

দিয়ে রাস্তার উপরে হু হু করে বয়ে যাচ্ছে। অনিমেশ ফিরছে। পরনে চেক কাটা লুঙ্গি গায় ছেঁড়া গেঞ্জি মাথায় গামছা জড়ানো। হাওয়া বিপরীত দিক থেকে বওয়ার দরুণ রখু মিয়া ভ্যান রিক্সাকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

'হ্যাঁ গো মিয়া, এইভাবে টেনে নিয়া লাভ নাই। তারচে চল হাঁটা মারি।'

ভ্যানওয়ালা রখু মিয়া পিছনে না ফিরে ধমক লাগায়--

'চুপচাপ বস'দিনি। তুমারে আর কষ্ট করতি হবে নানে।' রখুর গলায় ধমকের সুর। মুখে প্রচ্ছন্ন স্নেহের পরশ। বকরগঞ্জ থেকে এই দীর্ঘ আট মাইলের মধ্যে রাস্তার ধারে কোন গ্রাম নেই। মাঠ পেরিয়ে বহু দূরে মাঝে মাঝে সবুজ বনানীর শীর্ষদেশ চোখে পড়ে মনে করিয়ে দেয় জনবসতির কথা। অনিমেশের সাথে সঙ্গী হিসাবে আরও তুজন ছিল। ওরাও বকরগঞ্জ থেকে আসছে। একজন বৃদ্ধ অপরজন ওবই বয়সী। ওরা বসে বসে ঝিমুচ্ছে। অনিমেশ ওদের চেনে না। এখনও মাইল তুয়েক যাবার পর পাকা সড়ক পড়বে। অনিমেশ কি ভেবে নেমে পড়ল। রাস্তার ধারে একটা বাবলা গাছের গোড়ায়। রখু এক মনে ভ্যান টানছিল। অনিমেশ নেমে পড়তেই ও ফিরে চাইল। অনিমেশ বাবলা গাছের নিচেয় বসে পড়ল। অসহ্য গরম। গামছা মাথা থেকে খুলে মুখ মুছে পাশের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল রখুকে। ভ্যান থামিয়ে রখুও বসে পড়েছে ওর পাশে। অনিমেশ লুঙ্গির ট্যাক থেকে তুটো বিড়ি বের করে রখুর দিকে একটা এগিয়ে দিল। রখু বিড়িটা নিতে নিতে ভাবল 'আশ্চর্য ছেলে দেখদিনি। ও যে কি করে মনের কথা বোঝে'। আসলে রখু হাঁপিয়ে পড়েছিল, বিড়ির নেশাটাও চাগিয়ে উঠেছিল। আর ঠিক তখনই।

'বুজলা বাপজান তুমি কি আর ফিরবানা নাকি?'। অনিমেশ হাসল কোন কথা বলল না। শুধু বিড়িতে একটা লম্বা টান দিয়ে দূরের মাঠের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল আলের কাছেই একটা

নাম না জানা পাখি মুখ গুজে পড়ে আছে। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, বিবর্ণ ওর পালকগুলো হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে এদিক ওদিক। এই মুহূর্তে, ওর বুক ভারী হয়ে আসে। অনেক স্মৃতি অনেক কথা মুহূর্তে ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় শিমূল তুলোর মত 'এখনও অনেক পথ, এখনও অনেক দীর্ঘ কঠিন সময় পার হতে হবে'। রখুর মুখের দিকে তাকাল। আহা! যেন কোন শিল্পী তার ছেনি দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছে শ্রমজীবি এক কঠিন আত্মপ্রত্যয়ে ভরা এমন মায়াময় মুখ। 'না এসে কোথায় যাব বল। আমাকেত ফিরতেই হবে'। অনিমেশের কথা বন্ধ হয়ে যায়। বুকের মধ্যে বেজে ওঠে এক অজানা ব্যথা। চারদিকে মাঠের মাঝে সূর্যের প্রখর তাপে আগুনের লেলিহান শিখা নেচে নেচে বয়ে যাচ্ছে। রুক্ষ ফাঁকা মাঠ শষ্যহীন অনুর্বর। মাঝে মাঝে দু'একটা বাবলা গাছ নিস্তব্ধ নিথর। রখু বোঝে সবকিছু। কেউ আর কথা খুঁজে পায়না। মাটির দিকে ঝুঁকে বসে কি যেন ভাবতে থাকে। হাওয়ায় গ্রীষ্মের লু বয়ে যাচ্ছে। মাটি বন্ধা। নদীর জল লবণাক্ত। জীবন এখানে অসহায় করুণ।

ভারী অদ্ভুত বাচ্চুর কথা। কলেজ থেকে ফেরার পথে অনিমেশ ভাবছিল কথাগুলো। কথাগুলো গভীরভাবে ওর চেতনায় নাড়া দিয়েছিল। বাচ্চু বেশী কথা বলে না। সবকিছু যুক্তি দিয়ে বোঝে বলার চেষ্টা করে। অনিমেশ ভাবছিল বাচ্চুর কথার মধ্যে যুক্তি আছে। বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই ওর খেয়াল হল, দেখল সাইকেল থেকে বাবা নামছে। সাইকেলের পিছনে টিফিন কেরিয়ার। অনিমেশ এগিয়ে গেল তাড়াতাড়ি। এক হাত দিয়ে চটার গেটটা টেনে ধরতেই অবিনাশ ফিরে চাইল অনিমেশের দিকে। অনিমেশ লক্ষ্য করল বাবা কেমন যেন খুশির মেজাজে রয়েছে। প্রতিদিনের সেই ক্লান্তিকর ছোপ আর নেই। অনিমেশ বুঝতে পারছিলনা কি এমন খুশির খবর যা বাবাকে এমন মুখিয়ে রেখেছে। অবিনাশ সাইকেলটা অনিমেশের হাতে দিয়ে পিছন দিক থেকে বাড়ীর

মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে শুনতে পেল অনিমেশের গলা 'মা, বাবা ফিরেছে'। চা ফা রেডি কর। আজকে বাবা একটা হুল্লড় বাধাবে বলে মনে হচ্ছে।'

অবিনাশ হাত-পা ধুতে ধুতে অনিমেশের কথাগুলো শুনল। অনিমেশের গলার আওয়াজের মধ্যে কেন জানিনা বহুদিন পর ওর নিজের গলার আওয়াজ পেল। বারান্দায় ঝোলান গামছা টেনে এনে হাত-পা মুছতে মুছতে বহুদিনের একটা কথা ওর হঠাৎ মনে পড়ল। পার্টি অফিসে একদিন সন্ধ্যায় কি কথার মাঝে ও বলেছিল 'দেখিস আমার ছেলেও ঠিক আমার মত হবে।' তারপর দীর্ঘ সময় কেটে গেছে। তুলোর ফাসের মাঝ থেকে সূতো জড়ানো হুইলগুলো যখন জট পাকিয়ে এক একটা মাকুকে অচল করে দেয়, সেইরূপ বিবর্ণ রাজনৈতিক অস্থিরতা অনিমেশকে অবিনাশের চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। অবিনাশ অনিমেশের গলায় এখন আর নিজের গলার আওয়াজ পায়না। সবকিছু কথা হয়। যেন বন্ধুর মত। বাইরের লোক দেখলে বুঝতে পারবেনা কে কার সাথে কথা বলছে। পাশাপাশি দুখানা ঘর। সামনের বারান্দায় চায়ের কাপ হাতে নিয়ে অবিনাশ ঢুকতেই দেখতে পেল অনিমেশ মাদুর পেতে বসে আছে দেওয়ালে পিঠ রেখে। সারাদিনের ফ্যাক্টরীতে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর এই সময়টা ওর কাছে পরম প্রশান্তি বলে মনে হয়। অবিনাশ চায়ের কাপ মাটিতে নামিয়ে রেখে সটান শুয়ে পড়ল। অনিমেশ আড়চোখে দেখল। উঠে দাঁড়াল। ঘরে ঢুকে একটা বালিশ নিল। বাইরে আসতে দেখল, মা-ও চা নিয়ে এসে পড়েছে। অনিমেশ বালিশটা বাবাকে দিয়ে বসতে না বসতে শুনতে পেল।

'—কি হল, শুয়ে পড়লে যে। বাজারে যাবাতো নাকি ?'। অনিমেশ বুঝল, লাগল এবার। বাইরের দিকে তাকিয়ে চায়ের কাপটা তুলে চুমুক লাগায়। 'কি হল, ঘুমিয়ে পড়বা যে। উঠে বসে গল্প করোনা' 'দুত্তেরি।' অবিনাশ উঠে বসে। অনিমেশের দিকে তাকিয়ে বলে

'দেখ, এই জন্যেই তোকে বারবার বলি জীবনে বে থা করিস না। শ্লা হাড়মাস জালিয়ে খেলে সব।' তারপর মার দিকে তাকিয়ে বলে 'কেন, তোমার এতবড় জলজ্যান্ত ছেলেটা বাজারে যেতে পারেনা নাকি। তাকেও তো বলতে পার।"

অনিমেশ হাসে ' কেন বাবা। আমায় আবার জড়ানো হচ্ছে কেন। হচ্ছিল তো তোদের মধ্যে'।

'চুপ হারামজাদা'—কৃত্রিম ধমকের সুর অবিনাশের গলায়। মৃন্ময়ী চা খেতে খেতে পা ছড়িয়ে বলে 'আহা কথার ধরণ দেখদিনি। জলজ্যান্ত ছেলে —ষাট— ষাট।'

অবিনাশ শুয়ে পড়ে আবার। বলে 'হবে খুনি হবে খুনি। বাজারেত যাবই আজ। এইতো আসলাম। অনিমেশের সাথে দুটো কথা বলতে দাও।'

মৃন্ময়ী খালি কাপগুলো এক জায়গায় জড় করে উঠতে উঠতে বলে 'কথা বল আর যাই কর যদি রাজনীতি নিয়ে ঝগড়া ফগড়া কর তাহলে কিন্তু নিজেদের হাত পুড়িয়ে রান্না করে খেতে হবে বলে দিলাম।'

অবিনাশ একটা চারমিনার ধরায়। বালিশের উপর একটা হাতে মাথা রেখে অনিমেশের দিকে তাকিয়ে বলে 'কি বলছে তোমার মন্ত্রীরা। কি করবে এবার বল।'

'কিসের কি বলছ কিছুই তো বুঝতে পারছি না। পরিষ্কার করে ব'ল তবে তো বুঝব।' অনিমেশ ক্ষেপে যায়। তড়াক করে উঠে বসে। 'দেখ নেকামি করিস না। এতবড় একটা খবর আর এমন ভাব দেখাচ্ছিস যেন কিছুই জানিস না।' অবিনাশের সারাদিনের বুকের মধ্যে জমে থাকা আগুনের মত খবরগুলো যাচাই করে নিতে চায় অনিমেশের কাছে। এতদিনের বিশ্বাসের এক কঠিন সংকল্পের বাস্তব রূপায়ণ ওকে মুখিয়ে তোলে। বলে আমি তোকে বারবার বলেছিলাম কিনা এই পথ আমাদের নয়। মন্ত্রীত্ব ফন্ত্রীত্ব করা আমাদের পোষাবে না। আমরা পারব না এই প্রশাসনের মধ্যে থেকে মানুষের উপকার

করতে। কারণ এই ব্যবস্থাই আমাদের বাধ্য করাবে শ্রমজীবি মানুষের বাঁচার লড়াইকে ধ্বংস করাতে। কমুনিষ্টরা বুর্জোয়া কাঠামোর মধ্যে মন্ত্রীত্ব করেনা।

অনিমেশ বোঝে বাবা নকশালবাড়ীর ভূমিহীন কৃষকের আন্দোলনের কথা বলছে। যার আগুন দিকেদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। স্থবির সমাজ ব্যবস্থায় সামন্ত প্রভূদের শোষণের হাত থেকে মুক্ত হবার জন্য যে পথ দেখাচ্ছে নকশালবাড়ী গোপীবল্লভপুরের ভূমিহীন কৃষকেরা তাকেও অস্বীকার করতে পারেনা। তবু কোথায় যেন বাঁধা। পার্টি অফিসের নেতারা ওটাকে হটকারীদের আন্দোলন বলে, বলে বিচ্ছিন্নকামীদের আন্দোলন। অথচ ওরা যারা অনেকেই মার্কসবাদ পড়েছে মাওয়ের আদর্শ চীনের ইতিহাস পড়েছে তারা এই আন্দোলনকে কিছুতেই অস্বীকরে করতে পারে না। এই মুহূর্তে বাবার কথার যুক্তিগুলো অস্বীকার করতে পারে না। বাবার কথার মধ্যে বাচ্চুর যুক্তিগুলোর কি অদ্ভুত মিল। বাচ্চু বলত—

‘কোন লেদ মেশিনের আনাড়ী পরিচালক পাল্টিয়ে একজন দক্ষ পরিচালক বসিয়ে যদি তুমি বল সে আমায় এই মেশিন থেকে লোহার পরিবর্ত্তে কেক তৈরী করে দেবে তা যেমন সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি হ’চ্ছে বর্তমান ভারতবর্ষের রাষ্ট্র কাঠামো। এর চরিত্র হ’চ্ছে শোষণ করা। অথচ তুমি সেই কাঠামোর আমুল পরিবর্তন না করে পরিচালক পালটিয়ে কিভাবে শোষণ বন্ধ করবে?। আসলে রাষ্ট্র কাঠামো না পালটিয়ে তাতে পরিচালকের অংশ নিলে কার্যতঃ সেই শোষণেরই অংশীদার হয়ে যেতে হয়। তাই নকশাল বাড়ীর কৃষককে আমাদের পার্টি থেকে স্বাগত জানান উচিৎ। কখনই তাকে দমন করার জন্য নয়। কারণ এই মুহূর্তে এই সম্ভাবনা নয় অভ্যুত্থানকে দমিয়ে দেবার অর্থই হল কৃষকের এই জমি দখলের লড়াই যা কার্যতঃ রাষ্ট্র কাঠামো ভাঙ্গার লড়াইকে পিছন থেকে ছুরি মারা’।

বাচ্চু নেই। আহা. সেই অমল হৃদয়ের এক অগ্নিদীপ্ত বন্ধু হারিয়ে

গেছে। বাতাস উত্তপ্ত। এই লোনা মাটির বন্ধা জমির দক্ষিণের মাটিতে বাচ্চুর রক্ত ঝরেছে। রখু মিয়া অনিল সরদার সামসের হৃদয়ের মাঝে বাচ্চু বেঁচে আছে আজও। নদীর ঘাট এখনও অনেক দূরে। রখু ঝিমুচ্ছে। দূরের আদিগন্ত মাঠ থেকে হাওয়ায় উড়ছে লু। ধূ-ধূ মাঠের মাঝে এক ফালি সবুজের চিহ্ন নেই। অনিমেশের মনে পড়ে যাচ্ছে সবকিছু। বাবা বলতেন '—যে পার্টির গোপন রেডগার্ড বাহিনী নেই সেই পার্টির উপর যখন শোষণের হামলা নেমে আসবে তখন কত মানুষের যে প্রাণ যাবে তার ঠিকানা নেই। জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে যে পার্টি শোষকের হামলার পাল্টা জবাব দিতে পারেনা সেই পার্টি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেই একদিন। অনিমেশ এই মন্ত্রীত্বের মোহে পড়ে থেকে যদি জনগণের পাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে একদিন আসবে যেদিন জনগণের উপর শ্বেত সন্ত্রাসের ভয় নেমে এসে হতাশাগ্রস্থ করে তুলবে সাময়িক ভাবে। তোরা লক্ষ্যে পৌঁছাবার পরিবর্তে বহু দূরে পিছিয়ে যাবি। পারিস তো গ্রামে চলে যা। নিরন্ন মানুষের কাছে গিয়ে লড়াই করার সঠিক শিক্ষা নিয়ে নে।' সেই বিশাল হৃদয় একটি মানুষকে কি করুণ আর অসহায় ভাবে পুলিশে খুঁচিয়ে খুঁচয়ে মেরেছে। এখনও অনিমেশের স্পষ্ট মনে পড়ে। দিনান্তে সন্ধ্যায় বাবার সাথে তর্ক করতে করতে কতদিন পরম মমতায় বাবার কাঁচা পাকা চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে দিতে দিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে ওর বুক গর্বে ভরে উঠত।

পাকা রাস্তার কাছে আসতেই অনিমেশের সম্বিত ফিরে আসে। রখু এখন আর মাটিতে নেই। সিটের উপর বসে রিক্সা টানছে। হাওয়ার তেজ কিঞ্চিৎ মন্থর। ভ্যানের সামনের দিকে পা ঝুলিয়ে বসেছিল অনিমেশ। কি ভেবে অনিমেশ রখুর ডান প্যাডেলের উপর পা রাখতে চাইল। রখু ফিরে হাসল। অনিমেশের বাঁ পায়ের পাতা প্যাডেলের এক কোণায় চেপে বসেছে। রখুর ডান পা আর অনিমেশের বাঁ পা

সমান তালে হাওয়ার চাপ ভেদ করে ওঠানামা করে। ক্রমশ রাস্তা দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। দূরে দেখা যাচ্ছে সেই বিশাল বটগাছটা নয়নপুরের সীমানায়। নয়নপুর থেকে বদরহাট তিন মাইল। বদরহাটের নদী পার হয়ে মাইল খানেক মেঠো পথ ধরে আসলে পরে পাওয়া যাবে হাসনাবাদের ঘাট। ওখান থেকে অনিমেশ বাস ধরবে কলকাতার। ক্রমশ ওদের চোখের সামনে বহু দূরের সবুজ বনবীথির জমাট চিত্রপট ফুটে উঠছিল। ক্রমশ ওরা বটগাছের কাছে এসে পড়ছিল। আর যত বেশী সেই বিশাল বটবৃক্ষের কাছাকাছি হচ্ছিল ততই ওদের বুকের মধ্যে নদীর পাড়ভাঙ্গা ব্যাকুল স্রোতের মত স্মৃতিরা ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ওরা কিছুতেই পারলনা সেই বৃক্ষের ছায়ায় না থেমে। রখু মিয়া অনিমেশের আগেই নেমে পড়েছে। রাস্তার ধার থেকে ভ্যানটা টানতে টানতে এনে ফেলেছে গাছের ছায়ার নীচে। পাগলের মত রখু মিয়া ছুটতে ছুটতে বটগাছের পিছনে গিয়ে বসে পড়ে। অনিমেশ স্তব্ধ হয়ে বসেছিল ভ্যানের উপরেই। রখুকে না দেখতে পেয়ে নেমে যায়। গাছের পিছনে গিয়ে দেখে রখু মাটিতে উবু হয়ে বসে আছে মুখ নীচু করে। অনিমেশ পাশে বসে পড়ে। রখু মুখ তুলে চায়। ওর চোখে জল। অনিমেশ হারিয়ে ফেলে নিজেকে। সবকিছু ঝাপসা হয়ে যায়। বিড়বিড় করে রখু মিয়া বলে—'পারলাম না বাপজান তুমারে বাঁচাইতে পারলাম না।'

বাচ্চুকে ও বোঝাতে পারেনা। রখুর ঘরের দাওয়াতে বসে সেই রাতে অনিমেশ ওদের কোন যুক্তি দিয়েই বোঝাতে পারেনি। নয়নপুর, বকরগঞ্জ, বদরহাট, চাসনাল গ্রাম থেকে একে একে সবাই এসে পড়ে। অনিল সরকার, সামসের, তাহের মণ্ডল, কাওসুর আলি, খালেদ মিয়া একে একে সবাই। বাচ্চু চুপচাপ বসেছিল। রখু গোটা কয়েক বিড়ি ফেলে দিল চাটায়ের উপর। কারও মুখে কোন কথা নেই। কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। বিশেষ জরুরী বার্তা দিয়ে অনিমেশকে ও

আনা হয়েছিল। শেষে রখু মিয়াই কথা বলে উঠল—

'মাইয়া মানষীর মত চুপচাপ ক্যেন তুমরা। কও, যার যার কবার আছে, কও। হাগো ও সামসের, কি কবা কও।' সামসের চুপ করে থাকে। খালেদ তাই দেখে রেগে যায়। 'দেখেন হালায়, সন বছরে একবার মাত্তর ফসল হয় এখানে। জমিজেতি সব কিছু বাধাছাদা আছে রাম মাহাতোর কাছে। যে সব জমিগুলো হালায় আমাদের চষতি দিছে, তারও দশ আনা ছয় আনা ভাগও দেয় নাই। কয় কিনা বকেয়া পাওনা সুদে আসলে যা হয় তারও কিছু শোধ দিতে হবে। তাই দিয়া যে ধান পাইছি তা একমাসের খাওয়া তো দূরের কথা, পনের দিনেরও চলবে না এই হচ্ছে গোটা অঞ্চলের লোকগুলানের অবস্থা। রাম মাহাতো হালায় আমাগো চোখের সামনা দিয়া লরী বোঝাই ধান গুলান হাসনাবাদ বাজারের দিকি পার করতাছে। গ্রামের উপর দিয়া যখন হালায় ধূলা উড়ায় যায় তখন কও দিনি প্রাণডায় কেমন করে। আমরা তাই ঠিক করছি হালায়, এবছর লরী লুট করব। কিছুতেই চোখের সামনা দিয়া লরী গুলান যেতি দিব না। এখন কও তোমরা আমাগো পিছনে আছ কিনা।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে খালেদ হাঁপাতে থাকে। হাতের বিড়িতে টান দিতে গিয়ে দেখে নিবে গেছে। কি এক অজানা আক্রোশে বিড়িটাকে দূরে ছুঁড়ে দেয়! বাচ্চু লক্ষ্য করে। মুচকে মুচকে হাসে। ওর হাতের জ্বলন্ত বিড়িটা এগিয়ে দিয়ে বলে 'মাথা গরম করলে চলবে না মিয়া। বুঝিতো সব। কিন্তু সবাই মিলাতো ঠিক করতি হইব। হালায় রাম মাহাতো বছর বছর ধরি ঠকাবে এডা হতি পারে না। এখন কওদিনি কার কি কওয়ার আছে। হাগো ও তাহের, তুমি কি কও?' ঘরের খুঁটিতে তাহের হেলান দিয়ে বসে শুনছিল সব। বাচ্চুর কথায় তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলে 'হালার রাম মাহাতোর লরী লুটলেই চলব না। হালারে কোতল করতে হইব। আমার বাপডারে সদরে চালান ঐই হালায় দিছে। আমার ঘরগুলানরে আগুন কিডা দিছে কও তুমরা।'

অনিমেশ সবই বোঝে। এই মাইলের পর মাইল গ্রামের পর গ্রামের মানুষ না খেয়ে আছে। সারা বছরে এক মুঠো চালের সংস্থান করতে পারেনা। ঘাসের বীজ সিদ্ধ করে খেয়ে মানুষ বেঁচে আছে। জমির ফসল ফলে একবার তাও বর্ষার জলে। কোন প্রকল্প নেই। নেই ইরিগেশান্। নদীর জল লোনা। মাটি অনুর্বর। অথচ সেইসব মানুষগুলোকে ফাঁকি দিয়ে লাঠির জোরে এই অঞ্চলের জোতদার রাম মাহাতো দিনের পর দিন বেগার খাটায়। ফাঁকি দিয়ে তাদের পাওনা বছরে একবারের ফসলের ভাগে কারচুপি করে বদরহাটে আট বিঘে জমির উপর বিশাল বাড়ীতে ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার খুলে বসেছে। রাতে জেনারেটার দিয়ে আলো জ্বালানো হয়। ডিপটিউবয়েল দিয়ে মাহাতোর জমিতে জল জোগান হয়। বাড়ীর চাতালে সন বছর ধান শুকান হয়। মাত্র বার আনা রোজে গরীব চাষীরা রাম মাহাতোর বাড়ীতে নিরুপায়ে সেই ধান সিদ্ধ করে, ঝাড়ে, বাছাই করে বস্তায় ভরে লরীতে তুলে চালান দেয় হাসনাবাদ বসিরহাটের চালকল গুলোয়। সরকারের সমস্ত আইন কানুন রাম মাহাতো কিনে নিয়েছে পয়সার জোরে। কোন লেভি নেই নেই চেকপোষ্ট। পুলিশ, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, কোর্ট কাচারী, আইন আদালতে মাসহারা ব্যবস্থা। বড় বড় আমলারা মাসে একবার নৈশভোজে রাম মাহাতোর বাড়ীতে আসে জীপের ধূলো উড়িয়ে। মদের ফোয়ারা ছোটে। গ্রামের নিরক্ষর চাষীর ঘরের যুবতী মেয়েদের ধরে এনে চালান দেয় থানার বড়বাবুদের মনরঞ্জনে। এমন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার কোন ইচ্ছাই অনিমেশের নেই। তবুও প্রশ্ন থেকে যায় মনে পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা কি আছে আমাদের। এতগুলো নিরীহ মানুষ কি সঙ্গবদ্ধ—অনেক প্রশ্ন—।

'দেখ রাম মাহাতো এমন ধারা অত্যাচার করবে ইডা হতি পারে না। কিন্তু ধর রাম মাহাতোর ধান তুমি লুট করলা পারবা তো তার হেপা সামলাতি।'

'তাই বলে বছরের পর বছর এমন চলবে আর আমরা মুখ বুজ্যায় মার খাব উডা হতি পারে না।' অনিল সরদার রখুর দিকে চায়। 'লিচ্চয় লিচ্চয়'—রখু বাচ্চুর দিকে তাকায়।
অনিমেশ লক্ষ্য করে মোটা ফ্রেমের চশমাটার উপর বাচ্চুর চোখ ছুটো ধ্রুবতারার মত জ্বল জ্বল করে। হাসতে হাসতে বাচ্চু বলে—'ঠিক ঠিক বলছ সরদার। সন বছর তো মইরাই আছি না হয় আর একবার মরব। তবু মানুষগুলানরে জানাইতে হইব এমন ধারা অত্যাচার আর চলব না। আমরা যদি শুরু করি গোটা অঞ্চল কেন, নদী ডিঙ্গাইয়া শহর মুখো চলতি থাকব এমন ধারা প্রিতিবাদ।'
'ঠিক ঠিক ল্যায্য কথা কও তুমি বাচ্চু ভাই। আর তা বাদে তুমিই তো কও যে আমাদের লড়াইয়ের খবর শুইনা শহরগুলান থেকে সাড়া দিব তোমার আমার মত মানুষরা। আর তা বাদে এছাড়া পথ কি বা আছে। হালায় আমাদের ল্যায্য পাওনা চাইলেই তো আর দিতাছেনা কেও। কতবার তো রাম মাহাতোর হাত পা ধরলাম হালায় কি ফিরাইয়া দিছে আমার জোত জমি না বাবাডারে খালাসের কোন ব্যবস্থা করছে ?। দেয় নাই দেয় নাই। এখন মন ঠিক করছি হালায় হকের ধন কাইড়া নিব'। তাহেরের বুক ওঠা নামা করে। কালো রাতের বুক চিরে যেন বিদ্যুৎ চমকায় ওর চোখে। অনিমেষ চুপ করে থাকে—বার বার শুধু বাবার একটা কথা মনে পড়ে '—গ্রামে চলে যায় লড়াই করার শিক্ষা শিখে নেয় ভূমিহীন কৃষকের কাছ থেকে'।
সত্যি কি অদ্ভুত। তাহেরের কথায় ও চেতনায় ঘা মারে। শেষে ঠিক হয় নয়নপুরের গ্রামের লোকেরা ধান লুট করবে। সেখান থেকে সাথে সাথে গরুর গাড়ী বোঝাই করে সেই ধান ফেরত আনা হবে কাঁচা পথে পাঁচ মাইল দূরের চাসনালা গ্রামে। মোট কত ধান পাওয়া যাবে তার হিসাব রাখবে চাসনালার সামসের। এবং সেই ধান ভাগ ভাগ করে গ্রামের সমস্ত ঘরে মজুত করে রাখা হবে। পুলিশ তদন্তের জন্য আগে আসবে বকরগঞ্জে। একমাত্র তাহের ছাড়া বকরগঞ্জের কেউ জানবেনা

ধানগুলো কোথায় আছে। বদরহাটের অনিল সরদার নদীর ধার লক্ষ্য রাখবে। যাতে সেই রাতে নদী পার হয়ে রাম মাহাতোর কোন লোক যেন পুলিশকে খবর না দিতে পারে। নয়নপুরের লোকেরা যারা প্রত্যক্ষভাবে ঘটনার সাথে জড়িত থাকবে তারা হাঁটা পথে চাসনালা হয়ে বদরহাটে অনিল সর্দারের সাথে মিলবে। যদি নয়নপুরে পুলিশ ঢোকে তাহলে ওরা বদরহাট থেকে নদী পার হয়ে ভাগে ভাগে হাসনাবাদে ভোলা ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়ে উঠবে। মেয়ে ও বৃদ্ধরা ছাড়া জোয়ান কোন লোক যেন নয়নপুরে না থাকে। নয়নপুরের কাজের দায়িত্ব থাকবে খালেদ ও বাচ্চুর উপর। চাসনালা গ্রামের দায়িত্ব নেবে সামসেব। বদরহাটের দায়িত্ব থাকবে অনিল সরদার ও কাওসুরালির উপর আর বকরগঞ্জের দায়িত্ব নেবে রখু আর অনিমেশ। রাত শেষ হয়। যে যার কাজ বুঝে চলে যায়। বাচ্চু উঠানে নামে। রাত নিস্তব্ধ। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ফিরে আসছে আগামী দিনের শুভ্র সকাল। হাওয়ায় কিসের যেন পরশ। অনিমেশ বাচ্চুর কাছে এসে দাঁড়ায়। হাত ধরে থাকে কিছুক্ষণ। মনে পড়ে যায় বাড়ী থেকে আসার সময় বাচ্চুর মার কথা—'দেখিস বাবা যেখানেই থাকিস একবার যেন তুই আমার কাছে আসিস। অনিমেশ বাবা বাচ্চু বড় আবেগ প্রবণ ছেলে একটু খেয়াল রাখিস '।

'—হ্যাগো ঘুমাই পড়লা নাকি। রোদ তো পড়ে এল চল যাই। ওপারে বাস ধরতে হবে তো'। রখুর কথায় অনিমেশ ফিরে আসে চেতনায়। বিশাল বটগাছ ঠিক তেমনিই আছে। কেবল ঝরে গেছে সময়ের মাঝে অসংখ্য সবুজ পাতা। রুক্ষ বিবর্ণ হয়ে হাওয়ায় উড়ে উড়ে ছড়িয়ে পড়েছে অজানা পথে।

গভীর রাতে ধান লুট হয়েছে। কেমন করে যেন মুহূর্তের মধ্যে সেই সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে নয়নপুর থেকে বকরগঞ্জের ঘরে ঘরে।

অথচ এমন হওয়ার কথা ছিলনা। গভীর রাতে তাহেরের ঘরের দাওয়াতে বসেছিল অনিমেশ। ঘরে তাহের নেই। হঠাৎই গ্রামের পূর্ব দিগন্তে আগুনের লেলিহান শিখা দেখে চমকে ওঠেছে ও। তারপর এক সাথে বহু মানুষের মিলিত কণ্ঠস্বর আর মশালের আগুন ছুটতে দেখেছে অনিমেশ। গ্রামের সবাই ছুটে চলেছে কিসের নেশায় যেন রাম মাহাতোর বাড়ির দিকে। ছুটেছে অনিমেশও। মানুষের মিলিত ক্রোধে ততক্ষণে দাও দাও করে আগুন ধরে গেছে রাম মাহাতোর বিশাল বাড়ী। সমস্ত ধানের গোলা লুট হয়ে গেছে। তাহেরকে খুজে পায়নি অনিমেশ। শুধু দুই একবার শক্তিশালী রাইফেলের আওয়াজ মিলিত কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে নিচু স্বরে অনিমেশের কানে এসে বেঁজেছে। অনিমেশ পাগলের মত সেই খালি পা রুক্ষ মলিন নিরন্ন গ্রামবাসীর মাঝে তাহেরকে খুজেছে, পায়নি। শুধু কে যেন একবার ওকে বলেছিল নয়নপুরের ধান লুট করার সময় বাচ্চু ভাইকে রাম মাহাতোর লোকেরা নির্মম ভাবে মেরে ফেলেছে। ধান লুট তো হয়েছে কিন্তু তাহের মিয়া সেই খবর শুনে পাগল হয়ে গ্রামের সবাইকে তোমায় না জানিয়ে বের করে এনে রাম মাহাতোর বাড়ীতে চড়াও হয়েছে। ঘুম ঘুম আচ্ছন্নের মধ্যে অনিমেশ সেই রাতে ছয় মাইল দূরে ছুটেছে বাচ্চুকে দেখতে। মাঝ পথে কারা যেন ওকে আটকিয়ে দিলে জানেনা। ঘুম ঘুম আচ্ছন্নের মধ্যে ওকে কারা যেন হাটিয়ে এনেছে চাসনালায়। পরে শুনেছে মরে যাওয়ার আগে বাচ্চু নাকি খুজেছিল তাহের আর অনিমেশকে। তাহের মারা গেছে। অনিল সরদারকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে, কেবল ওরা খবর পায়নি ধানগুলো কোথায় গেল আর গোপন সংগঠন চাসনালার। যে আগুন তাহের মিয়া বাচ্চু ভাই জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে সেই আগুন মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত গ্রামে। গ্রাম থেকে দক্ষিণে আরো মানুষের হৃদয়ে। অনিমেষ শেষ বারের মত বিশাল বটগাছটার দিকে তাকাল। চোখের কোলে জল। রখু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে সামলাতে পারলে না। রোদের

তেজ ক্রমশ কমে আসছে। দূরের রুক্ষ মাঠের উপর বটগাছের ছায়া ক্রমশ বিশাল হচ্ছে। '—চল বাবজান উঠি।' অনিমেশ আর একবার বটগাছটার দিকে তাকিয়ে কোন রকমে রখুর ডান পাশে গিয়ে বসল, তারপর পরম মমতায় ও রখুর ভ্যান রিক্সার প্যাডেলে একটুখানি জায়গা করে নিয়ে একই শাক্তিতে বৃত্তাকারে প্যাডল করতে থাকল।

আর সে হেতু রখুমিয়া আর অনিমেশ দুজনের পায়ের চাপ একই সাথে প্যাডেলের উপর পড়ছিল সেইহেতু ভ্যানরিক্সার গতিবেগ বাড়ছিল। ক্রমশ রাস্তার দূরত্ব কমে আসছিল।



ষ্টপেজে কেউ আছে কেউ নেই

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর কোন কাজ থাকেনা। কুন্তলার বিশ্রী লাগে। বাড়ীতে মা ছাড়া দাদা বাবা তো অফিসে। সারাদিন সংসারের টুকিটাকি কাজের পর মা এই সময়ে একটু গড়িয়ে নিতে চায়। কুন্তলার ঘুম আসেনা। বই পড়া মানা। কোথাও যে যাবে তারও উপায় নেই। বিছানা থেকে নাবাই নাকি বারণ। সব সময় একটা গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। 'এটা কোরনা—উঁহু মামণি ডাক্তার বারণ করেছে'। অথচ ওর কি যে হয়েছে নিজে ত জানেই না জিজ্ঞাসা করলেও কেও কিছু স্পষ্ট করে বলে না। শীতকালের মেঘলা আকাশের মত সব সময় একটা শীতার্থ ভাব সারা মনে ছেয়ে থাকে।

দুপুরে বাড়ীর ঝুল বারান্দায় বেতের চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকে। বাড়ীর সামনে প্রশস্ত রাস্তাটা এই সময় নির্জন লাগে। অবেলায় ঘুম থেকে ওঠার পর যে অলসতা ঘিরে থাকে ঠিক সেইরকম অলস ভাব নিয়েই হরিশ মুখার্জি রোডটি পাণ্ডুর রোদে পিঠ এলিয়ে যেন বসে থাকে। কুন্তলা সব কিছু খুটিয়ে খুটিয়ে লক্ষ্য করে। বাড়ীর ঠিক সামনে বাস ষ্টপেজ। একটা লাইট পোষ্ট। পোষ্টের গায়ে একটু উঁচুতে টিনের প্লেটে সাদা নীল জমিনের উপর কালো হরফে বাস ষ্টপেজ

কথাটি লেখা। ঠিক ওর নিচেয় ফুটপাথের ধার ঘেঁসে যাত্রীরা এসে দাড়ায়। কত রকমেরই না লোকজন। দূরে একটা জলের কল। পেট মোটা গোলাকার খয়েরি রঙের একটা গম্বুজের ভেতর বোধহয় জলের পাইপ। কলের মুখে নাক চাপা সিংহের মূর্তি। ওটার থেকে অনবরত জল পড়ে জায়গাটা ভিজিয়ে তুলছে। কুন্তলা সবকিছুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিল। এ রাস্তায় গাড়ীর চলাচল বেশী হলেও বাসের সংখ্যা খুবই কম। প্রতিদিনই লক্ষ করে ষ্টপেজে দু'একজন করে লোক এসে দাড়ায় এসময়। কারও হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। কেও অলস ভঙ্গীতে কোমরে হাত রেখে মাথা নিচু করে দাড়ায়, কেও বা এদিক ওদিক তাকায়। কখনও ফুটপথের উপর দাড়ায় কেও রাস্তায় নেমে একটু চলাফেরা করে আর ঘন ঘন ডাইনে বাঁয়ে দূরের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে বাসের আশায়।

কুন্তলা জানে, লোকগুলো যতক্ষণ না বাস আসবে ততক্ষণই অপেক্ষা করবে। তারপর বাস আসলে ঠেলেঠুলে বাসে ওঠার চেষ্টা করবে। কণ্ডাকটারের গলার আওয়াজ আর সাইলেন্সারের শব্দে ক্ষণিকের নির্জনতাকে ভেঙ্গে খান খান করে দিয়ে দূরে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে। কুন্তলা ঘাড় ফিরিয়ে থাকবে ততক্ষণই যতক্ষণ ওর চোখের তারায় ও বেধে রাখতে পারবে দৃশ্যমান চলন্ত বাসটিকে। তারপর আবার স্টপেজের দিকে চোখ ফিরিয়ে এনে প্রতিক্ষা করবে নতুনতর যাত্রীর আশায়। দেখতে থাকবে ওদের যাবতীয় খুটিনাটি অভিব্যাক্তিগুলো।

সেদিন দুপুরে হটাৎই ওর কি যেন হয়ে গেল। বাতাসে শীতের আমেজ থাকায় গায়ে একটা নীল রঙের র‍্যাপার জড়িয়ে ঝুল বারান্দায় বেতের চেয়ারে পা তুলে জড়সড় হয়ে বসেছিল। সামনের বাস স্টপেজে দু একজন লোক করে জমতে সুরু করছে। তবু সেদিন কেন জানিনা একটা ছেলের দিকেই ওর দৃষ্টি আটকিয়ে গেল। তেইশ চব্বিশ

বছরের দোহারা চেহারা এক ঝাক মাথায় চুল, নীল একটা জীনের সর্ট কোর্ট গায়। কুন্তলার মনে হল ছেলেটা যেন ওর ভীষণ পরিচিত। কোথায় যেন দেখেছে। অথচ ও কিছুতেই মনে করতে পারছে না কোথায় এবং কখন ছেলেটিকে দেখেছে। ও অপলক ভাবে ওর দিকে তাকিয়েছিল। ছেলেটি পাশে দাঁড়ান একজন মাঝবয়সি লোককে কি যেন বলল। লোকটা বা হাতের কবজি তুলে ডানদিকের দূরের রাস্তার দিকে তাকাল। কুন্তলা ওকে দেখছে। স্টপেজের একটু দূরে বিপরীত দিকের বাড়ীগুলোর ফাঁক পেরিয়ে ত্রিযক ভাবে রোদ এসে পড়েছিল ফুটপাথের একটা অংশে। জায়গাটি অপেক্ষাকৃত অন্যান্য অংশের তুলনায় উজ্জ্বল আলোয় ভরেছিল। কিছুটা দূরে একটা পানবিড়ির দোকান। ছেলেটি ফুটপথ থেকে নেবে দাঁড়িয়ে একপা দুপা করে দোকানটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। রোদ জাগান আলোকিত অংশটুকু পেরতেই বা দিকের মুখের উপর হলুদ আলোয় তামাটে রঙটা আরো বেশী পরিষ্কার হয়ে উঠতেই কুন্তলার বুকের ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল। ছেলেটা দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল তারপর ঝুঁকে দেওয়ালের গা ঘেঁসে ঝোলান জ্বলন্ত নারকেলের দড়ি থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিতান্ত অবহেলায় দড়িটা ছেড়ে দিতেই দড়িটা ধাক্কা খেল দেওয়ালের গায়। একটু ধোঁয়া উড়ল জায়গাটা ঘিরে। কুন্তলা লক্ষ্য করল স্টপেজে ইতিমধ্যে লোক জমতে সুরু করেছে। সবাই নানান ভঙ্গিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দূরের রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। কুন্তলার দৃষ্টি ফিরে আনল ছেলেটির দিকে আবার। তীব্র আলোর মধ্যে ছেলেটির মুখটা কেমন যেন ধারাল মনে হচ্ছে।

হঠাৎ কুন্তলার চোখ দুটো কপালের পাশটা টন টন করে উঠলো। বুকের ভেতরে কে যেন হাতুড়ী পেটাচ্ছিল। ওর স্মৃতির গোপন ঘরগুলোর মধ্যে অন্ধের মত হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছিল ছেলেটির মুখ কিন্তু কিছুতেই ও মনে করতে পারছিল না। বিশ্রী শব্দ করে একটা কাক ঝুলবারান্দায় কুন্তলাকে না দেখেই বোধ হয় হাওয়ায় দোল খেয়ে

রেলিংয়ের উপর বসতে গিয়ে হুটপাট করে ডানা ঝাপটিয়ে সবে পড়ল। কুন্তলা ক্ষণিকের জন্য ঘাড় ফেরাল। ওর ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। হঠাৎই ও লক্ষ্য করল রোদ জাগান জায়গাটায় কেও নেই। আচমকা ছেলেটিকে দেখতে না পেয়ে ওব বুকেব ভেতরটা ধক করে উঠল। স্টপেজে দাঁড়ান অন্যান্য যাত্রীদেব মধ্যে ও খুঁজতে লাগল কিন্তু কই। হঠাৎই ও দেখতে পেল ফুটপথের কোল ঘেঁষে খুবই মন্থর গতিতে ছেলেটা হেঁটে চলেছে ময়দানমুখো। ওব ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। এই মুহূর্তে স্টপেজটা ওর কাছে ফাঁকা মনে হচ্ছে। ওর যেন মনে হচ্ছিল কতদিনের চেনা একজন আপনজন ওর চোখেব সামনে থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। ও চাইছিল ওকে দাঁড় করিয়ে রাখতে। ঠিক সেই মুহূর্তে সাইলেন্সারের বিকট আওয়াজে ও লক্ষ্য করলো আঠারো নম্বব বাসটা স্টপেজে এসে দাঁড়িয়েছে। কুন্তলা সাথে সাথে দূরে ছেলেটির দিকে তাকাল। ওর বুকের ভেতরটা কি এক অজানা মায়ায় মোচড়ে দিয়ে উঠল। ওর ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। রেলিংয়ের উপব বুকটা চেপে ঝুঁকে পড়ে ভাবছিল আর একটু অপেক্ষা করলেই ত পারত। ও যেন চাইছিল ছেলেটাকে ফিরিয়ে আনতে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখার চেষ্টা করল। 'কি আশ্চর্য ছেলেটা ত দাঁড়িয়ে পড়ছে'। একসময় ও বুঝতে পারল ছেলেটি স্টপেজের দিকেই এগিয়ে আসছে। কিন্তু যতটা দূরত্ব থাকলে তাড়াতাড়ি এসে বাসটা ধবতে পারত তার থেকে ও যে অনেকটা এগিয়ে। কুন্তলা এক অসম্ভব উত্তেজনায় দু হাত দিয়ে রেলিংটা চেপে ধরল। মাথার মধ্যে কারা যেন দাপাদাপি শুরু করেছে। বাসটা ছেড়ে দিয়েছে। একটু গা ছেড়ে দম নিয়ে পূর্ণ গতিতে বাসটা যখন দৌড়বে ঠিক সেই মুহূর্তে ছেলেটিও বিপরীত দিকে বাসের সমান্তরালে ছুটতে সুরু করল। কুন্তলা এক অজানা ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠছিল। বাসের এই দুরন্ত গতির সাথে পাল্লা দিয়ে ছেলেটি ছুটছে। কুন্তলা দেখছে। বুকের মধ্যে কি যেন হচ্ছে। '—ছেড়ে দিকনা বাব্বা, যদি স্লিপ করে পড়ে যায়।'

কণ্ডাক্টারের এক হাত বাইরে হাওয়া দুলছে। হঠাৎ কুন্তলার চোখের সামনে আর কিছুই দেখতে পেল না। সারা শরীর টলছে। মনে হল সমস্ত বারান্দাটা থর থর করে কাঁপছে। ক্রমশ ও বসে পড়ছিল বারান্দায়। চোখের চারপাশে কালো অন্ধকার ভেদ করে কতকগুলো অস্পষ্ট ছবি ফুটে উঠছে। কারা যেন একটা লাল বল শূন্যে উড়িয়ে দিয়ে লাফ দিয়ে দিয়ে ধরার চেষ্টা করছে। দৃশ্যটা মন্থর চলচিত্রের মত একেবেঁকে খুব ধীরে ধীরে অন্ধকার চোখের পরিধি ঘিরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর শরীর খুবই হাল্কা লাগছে। মনে হচ্ছে কারা যেন ওকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে বাতাস কেটে শহর গ্রাম গঞ্জ পেরিয়ে দূরে অনেক দূরে। ঘুম আসছে। ভীষণ ঘুম আসছে। কে যেন বহু দূর থেকে ওর নাম ধরে ডাকছে। 'শকুন্তলা, শকুন্তলা'। চেষ্টা করছিল চোখ খুলতে পারছে না। বারবার একটা দৃশ্যের ছেড়া ছেড়া টুকরো টুকরো কতকগুলো অংশ ভেসে উঠছে। '—জান শকুন্তলা—। সুজয়ের এই এক মিষ্টি দুষ্টুমি যতই বলি আমায় শকুন্তলা বলবেনা, আহা তবু দেখ, সেই কুন্তলা থেকে শকুন্তলা। রাগ ধরে যায়। অবশ্য ভালই লাগে। কিন্তু সুজয়ের নিজের বেলায় কিছুতেই নয়। একদিন বলেছিলাম '—মশায় আমি যদি শকুন্তলা হই তবে তুমি কি দুষ্মন্ত'। সে বেলায় সুজয় খুবই টনটনে। '—না-না কক্ষণই না—আমি কোন মেয়েকে ঠকাতে পারব না'। কুন্তলা আড়চোখে সুজয়কে দেখছিল। সেদিন ঠিক সেই মুহূর্তে একরাশ জাফরানি ফুল মুঠো মুঠো করে সুজয়ের জামায় গুজে দিতে কুন্তলার ভীষণ ইচ্ছা করলেও কি এক লজ্জায় ও রেষ্টুরেন্টের ঘেরা কেবিনের প্লেটের উপর রাখা কাঁটা চামচ নাড়তে নাড়তে দেখছিল সুজয়কে। সুজয় তখন কুন্তলার ছোট্ট রুমালটা চোখের উপর দিয়ে হাতের তালুতে মুখ রেখে কুন্তলার দিকে আড় হয়ে বলেছিল '—শকুন্তলা তোমার ছোট্ট রুমালটা দিয়ে আমার চোখ দুটো ঢাকা। আমি এখন কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বিশ্বাস কর। আমি দুষ্মন্ত না হয়ে সুজয় হয়েই থাকতে চাই।

তুমিও যদি সত্যই তাই চাও তাহলে আমার ঠোঁটে তোমার—।
ইস—কি লজ্জা—জানিনা বাবা—কি দুষ্টু—'।

'হেই হলট—থাম—স্টপ—'।

কেটে যাচ্ছে দৃশ্যটা। ঘন ঘন বদলে যাচ্ছে। '—সুজয়—সুজয়'। 'এইভাবে রিক্স নিয়ে কেও কি বাসে চড়ে। ও দাদা ষ্টপেজ থেকে তো উঠতে পারেন। কি সর্বনাশ মশায় সামনের দিকে ওভাবে চলন্ত বাসে—যদি হাত ফসকাত'। বহুদূর থেকে কারা যেন কুন্তলার কানের কাছে এমন ধরণের কথপোকথন করছিল। কিন্তু কোথায়। দৃশ্যটা আবার বদলাচ্ছে। বছর দশেক আগেও এরকম একটা পরিচিত দৃশ্যের মাঝে সুজয়কে দেখা গেছে। সুজয় কেমন যেন হয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ। অথচ কুন্তলার কিছুই করার ছিলনা। জিজ্ঞাসা করলে কিছুই বলত না। তবুও থাকতে না পেরে আবার কুন্তলাই তুলেছিল কথাটা। '—তুমিত দুরন্ত নও, তবে কেন এভাবে আমার বুকটা ভেঙ্গে দিচ্ছ সুজয়। কি হয়েছে কি তোমার'। দূরে, ময়দান আর আকাশের শেষ সীমায় সে দিন বিকালের অস্তমিত সূর্যের ক্ষীণ আলোর ছটা তখনও ছড়িয়েছিল। ভিক্টোরিয়ার বাগানের গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে কি যেন খুঁজছিল সুজয়। 'কৈ কি আবার হবে। কিচ্ছুনা'। ঘাড় ফিরিয়ে কুন্তলার মুখের উপর কি যেন খুঁজছিল সুজয়। 'না কেন।' তুমি কি বোঝনা এমন রিক্স নিয়ে কাজগুলো কেন কর তুমি। কলেজের ওই উচ ছাদের কার্নিশে দাড়িয়ে তুমি পোষ্টার লিখছিলে যদি পড়ে যেতে।'—'যেতাম'। পড়ে গেলে কি হত জান'। 'কি আবার হবে মারা যেতাম।' কুন্তলা কিছুই বুঝতে পারেনি। শুধু দুহাতের মাঝে থুতনি রেখে বলেছিল। 'বুঝিনা বাবা। কত লোকই তো মেনে নিয়েছে সবকিছু তবে তোমারই বা এত অস্থির কেন সুজয়। কত লোকই তো অপেক্ষা করে থাকে বাস ষ্টপেজে কৈ তোমরা কেন পারনা অপেক্ষা করতে সুজয়'। সুজয় ধীরে ধীরে উঠে দাড়িয়েছিল। ওর দিকে

হাত বাড়িয়ে দিয়ে ওকে ওর পাশে উঠে দাড়াতে সাহায্য করেছিল। তারপর সবুজ জাজিম পেরিয়ে যেতে যেতে বলেছিল, '—অনন্তকাল ধরে বাসের আশায় হা হুতাশ করে না থেকে পরবর্তী স্টপেজের দিকেই এগিয়ে যেতে হয়'। সায়াহ্নের ক্ষীণ আলোর ছায়ার মাঝে ও দাঁড়িয়ে পড়েছিল হঠাৎ। তারপর কুন্তলার মুখের দিকে তাকিয়ে সেই শেষবারের মত ওর কাঁধে হাত রেখে স্থির প্রত্যয়ে ওর চোখে চোখ রেখে বলেছিল 'মাঝপথে বাস এসে গেলে তখন জীবনের বাজী রেখে সেই চলন্ত বাসে ওঠার চেষ্টা করার নামই জীবন কুন্তলা। এটাই চিরকাল সুজয়রা করে এসেছে। তুমি দেখে নিও আগামীকালও তাই হবে—'। বিকালের পালিয়ে যাওয়া রোদ ছুইয়ে ছুইয়ে সেই যে সুজয় হারিয়ে গেছে তারপর আর ফেরেনি। কুন্তলা ভীষণ ঘুমের মধ্যে তারপর ডুবে গেছে। ঘুমতে ঘুমতে স্বপ্ন দেখছে কে যেন ভীষণ জোরে দৌড়চ্ছে কাল মসৃণ রাস্তার উপর দিয়ে। চিনতে পারছে না। কে দৌড়চ্ছে। বুঝতে পারছে না। শুধু অস্পষ্ট কয়েকটি ছবি কয়েকটি মুখ ক্রমশ এক থেকে দুই দুই থেকে চার চার থেকে অসংখ্য সংখ্যায় ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

কুন্তলা জ্ঞান হারিয়েছিল। ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে আসছিল। চোখ খোলার চেষ্টা করল। ঝাপসা। কতগুলো ছায়া ছায়া মুখ ওর দিকে ঘিরে রয়েছে। আরো বেশখানিকক্ষণ পর ওর চোখে আলো ফিরে আসল। বুঝতে পারল ও শুয়ে আছে খাটে। পায়ের কাছে দাদা। মাথায় কে যেন হাত দিয়ে আছে। বিছানার একধারে মা। ওঠার চেষ্টা করল পারল না। ও অনুভব করল মা ঝুঁকে কি যেন বলছে। শুনতে পেলনা। হঠাৎই দুপুরের ছেলেটির কথা মনের মধ্যে ভেসে উঠল। কুন্তলা কি যেন বলে উঠলো বিড় বিড় করে। কুন্তলার মা ঝুঁকে পড়ল ওর মুখের কাছে। শুনতে পেল ওর কয়েকটি অস্পষ্ট কথা—।

'—মা বলতে পার ওরা স্টপেজে অপেক্ষা করে না কেন'?।



অতএব হানা দাও

ঘুম ধরা দুপুর। মাসটি জৈষ্ঠির। হাওয়ায় তীব্র হলকানি ভাব। বাগানের একধারে তারকাঁটার বেড়ার পাশে ওরা ছয়টি ছেলে বসে আছে। সুতরাং ঘটনাটি এইভাবেই ঘটে যায়।

চারপাশে আসশেওড়ার বন—বনজ ঝোপঝাড়। সবুজ পাতার সমাবেশে এখানে এখন কিশোর বয়সের দুঃসাহসিকতা। আপাততঃ তারকাঁটা ঘেরা মরসুমি ফলের নিষিদ্ধ সীমানার মধ্যে ঘটনাটি ঘটবে। যেহেতু বাগানটি একজন মালিকের।

সারাদিন মৌরসী পাট্টা গোঁফ নিয়ে হিন্দুস্থানী পাহারাদার গাছের মগডালে বাধা ক্যানেস্তারার সাথে ঝোলান দড়ি টেনে টেনে অলুক্ষণে শব্দ করে চলে ঘট ঘট—ঘটাং ঘট ঘট। নিস্তব্ধ দুপুর। গ্রীষ্মের চিল ওড়া আকাশে এখন লু বইছে। তারকাঁটার ওপারে সুস্বাদু ফলের হাতছানি থাকলেও ওর কাছে যাওয়া মানা। মালিক পাহারাদার বসিয়েছে। যেহেতু ফলের গায়ে রঙ ধরেছে। ওগুলো পাড়া হবে। টুকরি বোঝাই করে চালান যাবে শহরে সেখান থেকে পয়সা এলে নতুন রঙ ধরবে মালিকের মনে। এই নির্জন বাগানবাড়ীর

মাঝে ভাঙা ভেনাসের নগ্ন মূর্তি আর সবুজ কাঠের রঙ করা জাফরি জানালার ওধারে নগ্ন হবে মালিকের মানসীপ্রতিম। পাহারাদার সতর্ক। অতএব হানা দাও ——।

সময়টা গ্রীষ্মের। হাওয়ায় তীব্র হলকানি। সুরুটা এইভাবেই হয়ে থাকে। ছয়টি ছেলে চেয়েছিল খেলার মাঠের ওধারে বাগানের দিকে। হাওয়ায় এখন পাকা আমের মিষ্টি গন্ধ।

শ্যাম ওঠে সাথে দোদো রামু ডাল ভাঙে ভেরেণ্ডার। '—চল বাগানে ঢুকে আম পাড়ি'। দোদো, রামু মাথা দোলায়।' মধু, ভোমলা, পানু অলস ভঙ্গিতে বসে থাকে। ঝালপটপটি গাছের ডাল ভেঙে জড়ো করে এক জায়গায়, ওগুলো কেটে ছড়ে গেলে আইডিনে, কাজ দেয়। মধুর মনে হল নিষিদ্ধ সীমানায় গেলে পা ছড়ে যাবে, হাত কাটবে, মাথা ফাটবে। তাই ঝালপটপটি গাছের দিকে তাকিয়ে বলে:— 'মাথা খারাপ নাকি দেখছিস না পাহারাদার রয়েছে। ধরা পড়লে মার খেয়ে মারা যাব নাকি।' শ্যাম, দোদো, রামু পুকুরের উঁচু পাড় বেয়ে আশসেওড়ার ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে মাঠ পেরনোর সময় মনে মনে ভাবে 'হানা না দিয়ে চুপচাপ বসে থাকলে মালিক কি আর সুমিষ্ট ফলগুলো তুলে দেবে—দেবে না—জানি ধরা পড়লে মার খাব তবুও—'। কাঁটা তার ডিঙ্গোতে হয়। বাইরে রামু সতর্ক সাবধানি। শ্যাম আর দোদো বাগানের মধ্যে। এই সেই নিষিদ্ধ বাগান সদা সতর্ক পাহারা। সামনেই হিমসাগর গাছ। বিশাল পাতার বিস্তৃতি নিয়ে কতদিন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা ভাবে। ওদের চোখ দুটো উত্তেজনায় জ্বল জ্বল করে। পাহারাদার ঝিমুচ্ছে। এক হাতে লাঠি আর এক হাতে অলুক্ষণে শব্দ তোলার দড়ি। দোদো ছিলা ছেড়া ধনুকের মত ছিটকিয়ে উঠে দাড়ায়। সা করে ছুড়ে দেয় ভেরেণ্ডার ডাল গাছের মাথায়। বিশাল গাছের পাতায় কেবল একটুখানি

দোলানি। ধুপ করে দু একটা আম পড়ে। পাহারাদার ছিটকে ওঠে। দেখে ফেলে ওদের। মুহূর্তে হাতের লাঠিতে জ্বলে ওঠে গ্রীষ্মের প্রদাহ। দোদো, শ্যাম ভড়কে যায়। ছুট দেয় এদিক ওদিক। বাগান থেকে বেরিয়ে আসতে চায় পারে না। কলেপড়া ইঁদুরের মত ছুটছে। পিছনে পিছনে তেড়ে আসছে পাহারাদার এক দুই তিন—। 'দোদো পালা'—শ্যাম ডানদিকে ঘুরে ধরা দেয়। দোদোকে বাঁচায়। শ্যাম মাটিতে নুইয়ে পড়ছে ক্রমশ। মাথায় চোট কপালে চোট নখ উঠে রক্ত—। তারের ওধারে দোদো, করুণ অসহায় হয়ে শ্যামকে মার খেতে দেখে চিৎকার করে ওঠে অশ্রাব্য ভাষায়। পাহারাদার থমকে যায়। ছেড়ে দেয় শ্যামকে।

পাহারাদার এক পা পেছয়। সময় বহে যায়। গ্রীষ্মের উত্তাপ বাড়তেই থাকে। অতএব পাহারাদারকে ভাবতে হয় কুটিল কৌশল। হাত নেড়ে মধুকে ডাকে। মধু তখন মাঠের এক প্রান্তে ভোমলা পেনুকে নিয়ে বসেছিল। কাছে যায়। পাহারাদার মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। শ্যামের সাথে মিশতে বারণ করে তিনটে বাদুড়ে খাওয়া আম দেয় ওদের। মাঠ পার হয়ে আবার নিজের জায়গায় ফিরে যাওয়ার সময় মধুরা আড়চোখে অপর প্রান্তে শ্যামদের দেখে। ওখানে তখন শ্যামদের চোখে আহত ক্রোধের সীমাহীন জ্বালা পেচিয়ে ধরে পাহারাদার সমেত মধুদের। ওরা আর এখন ছয়জন নয়, তিন তিন জন, মাঠের দুই প্রান্তে। মধুরা আম খেতে চায় পারে না। পচা গন্ধ থুথু ছেটায় মাটিতে। তারপর কি ভেবে ছুড়ে দেয় বাগানের দিকে। তাকায় ও প্রান্তে। কি এক অজানা ক্রোধে শ্যাম দোদো রামু ছিটকে উঠে দাড়ায়। পকেট থেকে বের করে গাম্বুল ফলের নিরেট গুলি। সাঁ—সাঁ—করে ছুড়ে মারতে মারতে এগুতে থাকে মধুদের দিকে। মধুরাও প্রস্তুত হয়। ভেরেরেণ্ডার ডাল ভেঙ্গে মাটির ডেলা খোয়া ছুড়তে থাকে শ্যামদের দিকে। এক পা এগোয়, এক পা পিছয়,

মাথায় লাগে—পায়ে লাগে— লাগে—রক্ত ঝরে, ঝরে রক্ত। ······।

ঠিক এই মুহূর্তে এ আর খেলা নয় সত্যিকারের যুদ্ধের মত। তবে তফাৎ এই যে, শ্যাম আর মধুরা কেউ জানে না কে তাদের শত্রু। কেবল অলেপ্যেয় সময় জানে তারকাঁটার ওধারে গোঁফে তা দিয়ে মজা দেখছে পাহারাদার।